SOME

ANECDOTES FROM THE LIFE OF RAJA RAM MOHUN ROY.

With a Geneological Table showing the succeeding Generations from Nittanand Bandopadhyaya down to the present surviving members of one branch of the family.

BY

NONDA MOHUN CHATERJE.

"Valour is still Value."

মহাত্মা

রাজা রামমোহন রায় সম্বন্ধীয়

শ্রীনন্দমোহন চট্টোপাধ্যায় প্রণীত

দ্বিতীয় সংস্করণ

Price 8 *Eight Annas.*

মূল্য ।৷০ আট আনা।

কলিকাতা।

ইংরাজী-সংস্কৃত যন্ত্রে
শ্রীআশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
২ নং নবাবদি ওস্তাগরের লেন।
সন ১২৯৮ সাল।

পূজনীয়

শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন রায়

মাতুল

মহাশয়ের

করকমলে

এই

পুস্তক

শ্রদ্ধার সহিত

সমর্পিত

হইল

ইতি।

স্তোত্র

যাও হে তপন তবে ফিরো না ভারতে আর।
শ্মশানে ভ্রমিলে বল সুখোদয় হয় কার॥

রতন মুকুতা হারে,
কিবা শোভা দ্বারে দ্বারে,
ভুবনে অমরাবতী পুরী মনোহর
সেসুখ দায়িনী ভূমি,
হের এবে দিনমণি,
করাল সে কালানলে হয়েছে অঙ্গার।

সে কিরণ রাহুগত,
দীন হীন আর্য্যসুত,
আপন পদেতে মারে আপনি কুঠার
জগতের হিত তরে,
ফিরি দেব শূন্য ভরে,
পবিত্র প্রণালী ভবে কর যে প্রচার
শিখাও শিখাও তবে,
ভারত সন্তানে সবে,
লইতে একতা রত্নে কণ্ঠেতে আবার।

পুণ্য প্রভা প্রভাময়,
বিস্তার ভারত চয়,
ধর্ম্ম তেজে আর্য্য-সুতে নাচাও আবার।
নতুবা উদয় দেব হয়ো নাকো আর।

মহাত্মা

রাজা রামমোহন রায়।*

১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে হুগলী জেলার অন্তঃপাতী রাধানগর নামক গ্রামে রামমোহন রায়ের জন্ম হয়। তাঁহার পিতামহ ব্রজবিনোদ রায় বিষ্ণুপরায়ণ ও স্বভাব-কুলীন-মাতামহ শ্যাম ভট্টাচার্য্য শক্তি-সম্প্রদায়ভুক্ত ও ভঙ্গের সন্তান ছিলেন। ব্রজবিনোদের পিতা কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের আদিবাস মুরশিদাবাদের অন্তঃপাতী শাঁকাসা গ্রাম। নবাব সরকারে চাকরী করিয়া "রায় রাঁয়" উপাধি প্রাপ্ত হন। তদবধি বংশ পরম্পরায় কেবল "রায়" উপাধিই চলিয়া আসিতেছে। অতঃপর তিনি, নবাব কর্ত্তৃক, হুগলী, বর্দ্ধমান প্রভৃতি কয়েক খানি জেলার জমীদারগণের নিকট রাজস্ব আদায় সংক্রান্ত তহসিলদারী পদে নিযুক্ত হন। এই কর্ম্মোপলক্ষে তাঁহাকে খানাকুল কৃষ্ণনগর গমন করিতে হয়। † পরমবৈষ্ণব কৃষ্ণচন্দ্র এই স্থানে সুবিখ্যাত অভিরাম গোস্বামীপ্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ গোপীনাথের শ্রীপাঠ সন্নিকট রাধানগর

* এই সংস্করণে "কলিকাতা রিভিউ" হইতে কতক সাহায্য গ্রহণ ও "নবজীবন" হইতে দিগম্বর ভট্টাচার্য্যের রাজার গীতের উত্তরগুলি উদ্ধৃত করা গেল।

† কৃষ্ণচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়ের রক্ষকস্বরূপ কতকগুলি শিক্ তৎসমভিব্যাহারে কৃষ্ণনগরে আগমন করে। একারণ রায় বংশ অনেক দিন পর্য্যন্ত শিক্দার নামে খ্যাত ছিলেন।

নামক গ্রামে বাস স্থাপন করেন। ইহাঁর তিন পুত্র—জ্যেষ্ঠ অমরচন্দ্র রায়, মধ্যম হরপ্রসাদ রায় ও কনিষ্ঠ ব্রজবিনোদ রায়। কৃষ্ণপরায়ণ ব্রজবিনোদ তৎকালীন পরম সমৃদ্ধিশালী লোক ছিলেন। তিনি যেরূপ দেবনিষ্ঠ পক্ষান্তরে তেমনি আবার দানশীল ছিলেন। তিনি যথাসাধ্য পরের উপকারে কখন বিমুখ ছিলেন না।

শাক্ত ও বৈষ্ণব এই উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে চিরকালই ঘোর বিবাদ। তৎকালে শাক্ত সম্প্রদায় কর্ত্তৃক যে ভীষণরূপ লোমহর্ষণ ব্যাপার সকল সম্পাদিত হইত তাহা ভাবিলেও হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। মেষ, মহিষ, ছাগ প্রভৃতি ত' দূরের কথা, শাক্তগণ নরবলীকেও ধর্ম্মের অঙ্গ বলিয়া গণনা করিতেন। এই সকল জঘন্য নিষ্ঠুরতা নিবারণই বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রধান উদ্দেশ্য। এমত অবস্থায় রামমোহনের মাতৃ-পিতৃকুল বিভিন্ন-সম্প্রদায়ভুক্ত হওয়া সামান্য আশ্চর্য্যের বিষয় নয়। এই বিষয়ের একটী সুন্দর গল্প আছে। তাহা এই—ব্রজবিনোদ অন্তিম কালে ভাগীরথীতীরস্থ হইলে পর শ্রীরামপুরের শ্যাম ভট্টাচার্য্য তাঁহার বদান্যতা ও কৌলীন্যের পরিচয় পাইয়া তদীয় অন্তিমশয্যাপার্শ্বে উপস্থিত হন এবং একটী ভিক্ষা-প্রার্থী হইয়া অগ্রেই প্রতিশ্রুত করিয়া লন। উদার-চরিত ব্রজবিনোদ, ভট্টাচার্য্যের কপট অভিসন্ধির মর্ম্ম ভেদে অসমর্থ হইয়া, অর্থীর আশা পূরণে স্বীকৃত হন। ভট্টাচার্য্য সময় বুঝিয়া বলিলেন—"মহাশয় যেরূপ প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তি তাহাতে এ ভিখারীর এ সামান্য আশাটী কেনই বা না পূর্ণ হইবে? যদি এইরূপই হয় তবে জাহ্নবী-সমীপে আজ্ঞা হউক, আপনার একটী পুত্রের সহিত আমার কন্যার বিবাহ দিবেন।" এক্ষণে সহজেই অনুভব করা যায়, যে, সরলমতি বিষ্ণু-পরায়ণ

ব্রজবিনোদ—একজন শাক্ত-সম্প্রদায়-ভুক্ত ভঙ্গ কুলীনের কথায় কিরূপ বিষম বিপদে পড়িয়াছিলেন। কিন্তু নিরুপায়! জাহ্নবী-সমীপে অন্তিম শয্যায় শয়ন করিয়া প্রতিজ্ঞা-সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছেন। বিষম সমস্যা! কি করেন। অতঃপর উপায়ান্তর না দেখিয়া সাত পুত্রকে আপন সমীপস্থ হইতে অনুমতি করিলেন এবং ভট্টাচার্য্য সম্বন্ধে সমুদয় কথা প্রকাশ করিয়া বলিলেন। একে একে ছয় পুত্রই, পিত্রাজ্ঞা পালন করিয়া কুলধর্ম্মে জন্মের মত জলাঞ্জলি দিতে অস্বীকৃত হইলেন। পবিশেষে পঞ্চম পুত্র রামকান্ত, অতীব আগ্রহ সহকারে, পিতৃ-সত্য পালনে স্বীকৃত হন। ব্রজবিনোদ তাঁহার এরূপ সাধুতায় ও ত্যাগস্বীকারে পরম পরিতুষ্ট হইয়া বলিলেন—"বৎস তোমারি প্রকৃতি গুণে আমি এ অন্তিম কালের সত্য হইতে নিষ্কৃতি পাইলাম, আশীর্ব্বাদ করি তুমি, পুত্র পৌত্রাদি লইয়া, পরম সুখে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ কর; আমার এ অন্তকালের আশীর্ব্বাদে, নিশ্চয় জানিও, তোমার সন্ততিগণই সর্ব্বত্র প্রতিপত্তি লাভ করিবে।" অনন্তর তিনি হরিনাম হৃদয়ে ধারণ করিয়া লোকান্তরিত হইলেন। ভট্টাচার্য্যও, আশানুরূপ ফল লাভে কৃতকার্য্য হইয়া, সানন্দ মনে গৃহে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক, যথাসময়ে রামকান্তকে কন্যা সম্প্রদান করিলেন। এই রামকান্তের ঔরসে ভট্টাচার্য্যকন্যা তারিণী দেবীর গর্ভে রামমোহনের জন্ম হয়।

তারিণী দেবী সচরাচর ফুলঠাকুরাণী * নামে খ্যাত ছিলেন।

---

* হিন্দু পরিবার মধ্যে যেমন জ্যেষ্ঠ, মধ্যম—বড়, মেজো নামে খ্যাত পঞ্চম সেইরূপ "ফুল" বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। পঞ্চম পুত্রের স্ত্রী বলিয়া তারিণী দেবীকে সকলে 'ফুল বউ" বলিয়া ডাকিত।

অতঃপর এই প্রস্তাব মধ্যে তিনি ঐ নামেই উক্ত হইবেন। ফুল-ঠাকুরুণ অতি বুদ্ধিমতী ও অশেষ গুণবতী রমণী ছিলেন। সুবিখ্যাত মহাবীর নেপোলিয়ন বোনাপার্ট আপন জননী সম্বন্ধে বলেন—"তিনি বাহ্য দৃশ্যে স্ত্রী-আকৃতি-বিশিষ্টা ছিলেন বটে, কিন্তু কার্য্যে পুরুষাপেক্ষা অণুমাত্র ন্যূন ছিলেন না।" * আমাদের দেবী ফুলঠাকুরাণীও এই প্রকৃতির নারী ছিলেন। সৎকার্য্য ব্যতীত আদৌ মন্দ বিষয়ের চর্চ্চা পর্য্যন্ত তাঁহার নিকট প্রশ্রয় পাইত না। নৃশংসতা ও নীচ প্রকৃতির তিনি বিশেষ বিদ্বেষিণী ছিলেন। মিথ্যা কথা কি কোনরূপ অন্যায় ব্যবহার তিনি কখন সহ্য করিতে পারিতেন না। বাস্তবিক তদীয় সমকালীন স্ত্রী-কুলের মধ্যে তাঁহার ন্যায় গুণশালিনী অতি বিরল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অনেকেই বলিয়া থাকেন নেপোলিয়ন, মাতার প্রকৃতি গুণেই, এতাধিক বীর্য্যবন্ত হইয়াছিলেন ; এ স্থলে ইহাও অসঙ্কুচিত চিত্তে বলা যায় যে, রামমোহন মাতার প্রকৃতি গুণেই অসাধারণ নামের সার্থকতা সম্পাদন করিয়া একদা দুঃখসন্তপ্তা ভারতের মুখোজ্জ্বল করিয়াছিলেন।

ফুলঠাকুরুণ শাক্তের ঔরসে জন্ম গ্রহণ করেন বটে কিন্তু পতি-গৃহে আসিয়াই বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত হন। ইহাতে পরম বৈষ্ণব রামকান্তের আর আনন্দের সীমা পরিসীমা ছিল না। রামকান্ত শৈশবকাল হইতেই পিতৃধর্ম্মে দীক্ষিত হন। তাঁহার পরলোকবাসী পিতৃ-সংপ্রতিষ্ঠিত রাধা গোবিন্দ পদে সচন্দন পুষ্পাঞ্জলি না দিয়া জল গ্রহণ দূরে থাকুক কাহারও সহিত বাক্যালাপও করি-

---

* Hazlit.

তেন না। ব্রজবিনোদ রায় মহাশয় তাঁহার সত্য পালক পুত্রকে সমস্ত বিষয়ের সর্ব্বেসর্ব্বা করিয়া যান। কিন্তু পরে তাঁহার সকল পুত্রই বিষয়ের সমান অংশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। রামকান্ত হুগলী জেলার অন্তঃপাতী খানাকুল কৃষ্ণনগর প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রাম ইজারা লন। এই সকল কারণে বর্দ্ধমানাধিপের সহিত তাঁহাকে নিয়তই প্রায় কলহে লিপ্ত থাকিতে হইত। এই সময়ে রাম-মোহনের জন্ম হয়। রামকান্ত বর্দ্ধমানাধিপের অন্যায় ব্যবহার সহ্য করিতে না পারিয়া সাংসারিক কার্য্যে এক প্রকার বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়েন। এবং একটী তুলসীর উদ্যানে নিয়ত অবস্থান পূর্ব্বক হরিনাম জপ করিয়া প্রফুল্ল চিত্তে দিন যাপন করিতেন এবং সময় মত জমীদারীর কার্য্যও পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। তাঁহার পরম বুদ্ধিমতী স্ত্রীর মন্ত্রণা ব্যতীত তিনি কোন কার্য্যই করিতেন না। ফুলঠাকুরুণ রামকান্তের এক প্রকার মন্ত্রী ছিলেন।

একদা তিনি কোন উৎসব উপলক্ষে কনিষ্ঠ পুত্র রামমোহন সমভিব্যাহারে পিত্রালয়ে গমন করেন। রামকান্তের ফুলঠাকু-রুণ ব্যতীত আরো দুইটী পত্নী ছিল। জগন্মোহন, রামমোহন দুই সহোদর ও রামলোচন নামে তাঁহাদের এক বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ছিলেন।

ফুলঠাকুরুণ পিতৃভবনে যথা সময়ে উপনীত হইলেন। একদা তাঁহার পিতা শ্যাম ভট্টাচার্য্য দেবী-পূজা সমাপ্ত করিয়া সংপূজিত বিল্বদল গ্রহণ পূর্ব্বক দৌহিত্র রামমোহনকে প্রদান করেন। রাম-মোহন সেইটী চর্ব্বণ করিতেছেন মাত্র ইত্যবসরে ফুলঠাকুরুণ তথায় আসিয়া উপনীত হইলেন এবং রামমোহনকে বৈষ্ণব-ঘৃণিত বিল্ব-পত্র চর্ব্বণ করিতে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ পুত্রের মুখ প্রক্ষালন

করিয়া দিলেন এবং মহা-কুপিত হইয়া পিতাকে বলিলেন,—"একি! আপনি বিষ্ণুপদ-মন্ত্রপূত পবিত্র তুলসীর পরিবর্ত্তে রামমোহনকে বিল্বপত্র চর্ব্বণ করিতে দিয়াছেন? আশ্চর্য্য! মাতামহ হইয়া অবোধ বালকের প্রতি কিরূপে এই নিষ্ঠুর ব্যবহার করিলেন?" রামমোহনের পিতৃমাতৃ-কুল যেরূপ ধর্ম্মাবলম্বী তাহা পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। ফুলঠাকুরুণ শাক্ত সম্প্রদায়ীর রীতি নীতি সম্যক্ জ্ঞাত ছিলেন, একারণ পিত্রালয়ে পুত্রের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতেন। কিন্তু এদিকে ভট্টাচার্য্য মহাশয় মহা গোল বাধাইয়া দিয়াছেন। যাহা হউক বৃদ্ধ ভট্টাচার্য্য কন্যার নিকট এবম্প্রকার তিরস্কৃত হইয়া মনে মনে বিষম রাগান্বিত হইলেন এবং কন্যাকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন—"তুই গর্ব্ব করিয়া আমার মন্ত্র-পূত-বিল্বপত্র যে ঘৃণা করিয়া প্রক্ষেপ করিলি ইহাতে নিশ্চয় জানিস্, এ পুত্র লইয়া তুই কখন সুখী হইতে পারিবি না। তোর এই বালক কালে বিধর্ম্মী হইবে।" ইহা সহজেই অনুভূত হইতে পারে যে স্বধর্ম্মপ্রিয়া জননী হৃদয়ে এই বাক্য কিরূপ শেল-সদৃশ লাগিয়াছিল। যাহা হউক ফুলঠাকুরুণ কঠোর শাপ হইতে নিস্কৃতিলালসায় পিতৃ-পদে লুণ্ঠিত হইয়া অনেক কাকুতি মিনতি করিলেন। কিন্তু বৃদ্ধের শাপ কিছুতেই টলিবার নয়, তবে যতই হউক কন্যা ত'। ভট্টাচার্য্য কতক তুষ্ট হইলেন বটে কিন্তু শাপান্তের আর উপায় ছিল না। অনন্তর ভট্টাচার্য্য বলিলেন—"আমার বাক্য নিষ্ফল হইবার নয়, তবে ইহাও নিশ্চয় জানিও যে উত্তর কালে তোমার রামমোহন রাজপূজ্য ও অসাধারণ লোক বলিয়া খ্যাত হইবে।" এই গল্পটী কতদূর সত্য বলা যায় না কিন্তু রায়-বংশীয় আবাল বৃদ্ধের নিকট এইরূপ শুনা

যায়। অনেকে বলেন, রামমোহন বিলাত গমন কালীন তাঁহার জনৈক বন্ধুর নিকট এই গল্পটী করিয়াছিলেন।

· এই ঘটনার অল্প দিন পরে ফুলঠাকুরুণ সপুত্র পতিভবনে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন এবং শাপান্তের বিষয় স্বামীর নিকট আমূল বিবৃত করিলেন। রামকান্ত ও ফুলঠাকুরুণ উভয়েই এই সময় হইতে বালক রামমোহনের ধর্ম্মনীতি সম্বন্ধে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতেন। রামমোহন এই সময় পূর্ব্বতন প্রথানুসারে গ্রামস্থ পাঠশালায় আরবী, পারসী ও বাঙ্গালা ভাষা শিখিতে আরম্ভ করেন।

উত্তরকালে যিনি যেরূপ পদবীর উপযুক্ত হন, শৈশবাবস্থায় ও অনেক স্থলে তাহার প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যায়। সুপ্রসিদ্ধ নেপোলিয়ন, নেল্‌সন প্রভৃতি বীরপুরুষগণ আপন আপন পদবীর বাল্যকালে বিশেষ পরিচয় প্রদান করেন। রামমোহনও শৈশবাবস্থায় আপন মহত্ত্বের অনেক পরিচয় দিয়া ছিলেন। কার্য্যানুরোধে তদীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জগন্মোহন রায় কৃষ্ণনগর হইতে প্রায়ই স্থানান্তরে থাকিতেন। রামমোহনের লেখাপড়ায় প্রগাঢ় যত্ন ও অনুরাগ দেখিয়া তিনি তাঁহাকে আপন সন্নিধানে লইয়া যান। তৎকালে রামমোহনের বয়ঃক্রম পাঁচ বৎসর মাত্র। ভাল লেখাপড়া পাইবেন, এই আশায় তিনি এরূপ অল্প বয়সে অবাধে মাতৃসন্নিধান পরিত্যাগ করিয়া ভ্রাতার অনুগামী হইলেন। এ বয়সেও মমতা তাঁহার নিকট হার মানিল। সেস্থানে একদা বাল্যস্বভাব-সুলভ গোসা করিয়া তিনি দুগ্ধপানে বিরত হন। সকলেই অনেক সাধ্যসাধনা করিল কিন্তু তিনি কাহারও কথা শুনিলেন না। পরিশেষে জগন্মোহন আসিয়া তাঁহাকে যখন

বলিলেন, যে—"যদি তুমি এরূপ কর তবে তোমার কিছুই লেখা-পড়া হইবে না, আর এখনিই তোমাকে মায়ের নিকট পাঠাইয়া দিব।" রামমোহন তখন মহা ভীত হইয়া তৎক্ষণাৎ দুগ্ধ পান করিয়া ফেলিলেন।*

রামমোহন প্রথমতঃ অত্যন্ত বিষ্ণুপরায়ণ ছিলেন। গৃহদেব-দেবী রাধা গোবিন্দের প্রতি ঐকান্তিক ভক্তি ব্যতীত তিনি আর কিছুই জানিতেন না। কথিত আছে, মানভঞ্জন যাত্রা তিনি বাটীতে অভিনয় করিতে দিতেন না। বৃন্দাবনবিহারী ভুবনেশ্বর কৃষ্ণচন্দ্র যে প্রিয়মহিষী রাধারাণীর পায় ধরিয়া কাঁদি-বেন, ভুবনমোহন শিখিপুচ্ছ, পীতধড়া যে ধুলায় ধূসরিত হইবে, ইহা ভারতের ভাবী ধর্ম্মসংস্কারকের চক্ষুঃশূল ছিল। আহা! যদি সেই মহাত্মা সাহস করিয়া ধর্ম্মের পবিত্র কুঠার গ্রহণ পূর্ব্বক একাকী ভারতের নিবিড় ভয়-সঙ্কুল কুসংস্কারবনোচ্ছেদনে কৃত-সঙ্কল্প না হইতেন তবে কে বলিতে পারে, ভারতের অধুনাতন অবস্থা এত দিনে কিরূপ দাঁড়াইত? ইহা, বোধ করি, কাহারও অবিদিত নাই যে কিরূপ ভয়ানক সময়ে তিনি এই পবিত্র কুঠার গ্রহণ করিয়াছিলেন।

তাঁহার মাতার পিতৃশাপ অনুক্ষণই হৃদয়ে জাগরূক ছিল। তিনি স্বামীকে সর্ব্বদাই রামমোহনের ধর্ম্ম শিক্ষা বিষয়ে বিশেষ যত্নশীল হইতে বলিতেন। রামকান্ত সচিব-শ্রেষ্ঠ ফুলঠাকুরুণের বাক্যানুযায়ী রামমোহনকে হিন্দুধর্ম্মে বিশেষরূপ মর্ম্মজ্ঞ করিবার

---

* এই গল্পটী রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র রাধাপ্রসাদ রায় মহাশয় লেখকের কোন পূজনীয় ব্যক্তির নিকট বলিয়াছিলেন।

আশায় সংস্কৃত অধ্যয়নার্থ উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে প্রেরণ করেন। এই ভাষায় তিনি হিন্দুধর্ম্মনীতি ও আইন পাঠে নিযুক্ত হন। এই অবস্থায়ও বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রতি তিনি এত আশক্ত ছিলেন যে, বৈষ্ণবদিগের প্রধান ধর্ম্ম গ্রন্থ শ্রীমদ্ভাগবতের এক অধ্যায় পাঠ না করিয়া জল গ্রহণ করিতেন না। অগ্নি, তৃণকাষ্ঠ পা-ইলে, আর কতক্ষণ নিস্তেজভাবে থাকে? আর্য্যধর্ম্মনীতির প্রকৃত রসাস্বাদন করিয়া রামমোহন প্রকৃষ্টপথেই অগ্রসর হইয়া-ছিলেন। তিনি গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া ষোল বৎসর বয়ঃক্রমকালে এক গ্রন্থ রচনা করেন। বলা বাহুল্য যে ইহাতে পৌত্তলিক মাত্রেই তাঁহার উপর খড়্গাহস্ত হইয়াছিল। অতঃপর রামমোহ-নের বিষয় আর কিছুই গোপন রহিল না। ক্রমে ফুলঠাকুরাণী-ও সকল শুনিলেন—আর রক্ষা নাই। রামমোহনকে তিনি অবিলম্বে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। রামকান্ত রাম-মোহনকে প্রগাঢ় স্নেহ করিতেন বটে, কিন্তু ফুলঠাকুরুণের স্বামীর উপর যেরূপ আধিপত্য ছিল তাহাতে রামকান্তর সাধ্য হইল না যে রামমোহনের পক্ষে কোন কথা বলেন। যাহা হউক রাম-মোহন এইরূপে পিতৃগৃহ হইতে বহিষ্কৃত হইলেন এবং ভারতের নানা স্থান পরিভ্রমণ পূর্ব্বক পরিশেষে লামাপূজক তিব্বতদেশে উপস্থিত হইয়া ধর্ম্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। মহাত্মা রামমোহন রায়ের জীবনবৃত্তের এই স্থানটী যখন স্মৃতিপথে সমুদিত হয়, তখন হৃদয়-সাগরে যে কি অপূর্ব্ব ভাব-লহরী উদ্বেলিত হয় বলা যায় না। এরূপ নবীন বয়সে আশ্রয়-শূন্য হইয়া একাকী, পৌত্তলিকপূর্ণ বিদেশে তাহাদের ধর্ম্মের উপর আঘাত করা, কতদূর দুঃসাহসের কার্য্য, তাহা সহজেই অনুভূত হইতে পারে। লোকের সাহস

এক না এক বিষয়ে পরিণত হইরা থাকে। তাঁহারা আপনাপন অভীষ্ট পথে আসিবার জন্য কোন বাধাই মানেন না। খ্রীষ্ট, গালিলিও, সক্রেটিস্ প্রভৃতি অসাধারণ লোকেরা জীবন হারাইব জানিয়াও আপন অভীষ্টপথের রেখা মাত্র বাহিরে পদার্পণ করেন নাই। টস্‌কানীরাজ পরসেন্না রোম অধিকার করিলে পর, তদ্দেশীয় মুসস্ স্কিভোলা নামক জনৈক যুবক, কোন উপায়ে বিজয়ী রাজসমীপে উপনীত হন এবং রাজা ভ্রমে তদীয় জনৈক পারিষদকে হত্যা করেন। রাজা তৎক্ষণাৎ হত্যাকারীর প্রতি ভীষণ যন্ত্রণা দিয়া বধের আজ্ঞা দেন। স্কি-ভোলা এবম্বিধ দণ্ডাজ্ঞা শুনিয়া পার্শ্বস্থ প্রজ্বলিত হুতাশনে হস্ত প্রদান করিয়া দেখান যে, কোন যন্ত্রণাই তাঁহাকে নিরস্ত করিতে পারে না। পরসেন্না যুবকের সাহস দর্শনে চমৎকৃত হইয়া, তাঁহার অপরাধ মার্জ্জনা করেন এবং রোম অধিকারে বিরত হন। এইরূপে জানা যায়-সাহসই উন্নতির দ্বারস্বরূপ। রাম-মোহন রায় বলিতেন—"জগতে সাহস অবলম্বনই মনুষ্যের প্রথম কর্ত্তব্য কর্ম্ম" * সেই সাহসের মুখ চাহিয়াই, ষোড়শ বৎসর বয়ঃক্রমকালে তিনি, নিতান্ত অসহায় অবস্থায়, সত্যের জন্য পিতৃভবন পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সেই মহাত্মার এই মহাবাক্য যেন প্রতি ভারতবাসীর হৃদয়স্থ শিরায় শিরায় গ্রথিত হইয়া থাকে।

এইরূপে রামমোহন ক্রমান্বয়ে চারি বৎসর দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া বেড়ান। রামকান্ত সেই কয়েক বৎসর কেবল হা-হুতাশে

* The first duty of man in this world is to subdue fear.

কাটাইয়াছিলেন। তিনি সর্ব্বদাই বলিতেন—"রামের জন্য যেমন দশরথের প্রাণ যায়, সেইরূপ আমার রামের জন্য বুঝি আমাকে প্রাণ দিতে হয়!" স্বামীর এ প্রকার ভাব দেখিয়া, ফুলঠাকুরাণী কতকটা সদয় হন এবং রামমোহনকে পুনরায় গৃহে লইয়া আসিতে অনুমতি করেন। অনন্তর রামকান্ত পরমাহ্লাদ সহকারে, পুনরায়, রামমোহনকে গৃহে লইয়া আইসেন। এই সময় রামমোহনের বয়ঃক্রম ২০।২১ বৎসর মাত্র।

রামকান্ত ভাবিয়াছিলেন—রামমোহন নানা কষ্টে পড়িয়া এবার বুঝি সম্যক্ শিক্ষা লাভ করিয়াছেন, অতঃপর পৌত্ত-লিক ধর্ম্ম বিরুদ্ধে আর উত্থিত হইবেন না। সুখের বিষয় তাঁহার পিতার সে অনুমান কোন কার্য্যের হয় নাই। তাঁহার সেই রামমোহন, সেই সত্যের কুঠার লইয়া, কুসংস্কার বনোচ্ছে-দনে, কেবল অগ্রসরই হইতেছেন। পিতা পুত্র মধ্যে, এই সময়, নিয়তই প্রায় তর্কলহরীর বেগ চলিয়া যাইত। রামকান্ত কিছুতেই আর পুত্রকে, আপন অভীষ্ট পথে আনয়ন করিতে পারিলেন না। তাঁহার সকল কৌশলই নিষ্ফল হইল। অতঃপর ফুলঠাকুরাণী, আর কাহারও কথা শুনিলেন না। ভট্টাচার্য্যের শাপ স্মরণ করিয়া, জন্মের মত রামমোহনকে বাটী হইতে বহি-ষ্কৃত করিয়া দিলেন। বলা বাহুল্য যে এই রঙ্গস্থলে উভয় পক্ষেরই আপদের শান্তি হইল। রামমোহন, জীবিকা নির্ব্বাহের অনন্যোপায় না দেখিয়া, অগত্যা রাজ-সরকারে কোন কর্ম্মের প্রার্থী হন। এবং রাজস্ব সংক্রান্ত কোন কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া রঙ্গপুর গমন করেন। কার্য্যদক্ষতা-গুণে, ক্রমে তিনি দেওয়ানী পদে উন্নীত হন। তৎকালে বাঙ্গালীর পক্ষে উহাই সর্ব্বোচ্চ

পদ ছিল। এই পদে থাকিয়া তিনি সচরাচর, দেওয়ান নামে খ্যাত হন। তাঁহার পরিবারস্থ সকলেই তাঁহাকে "দেওয়ানজী" বলিতেন। এখনও অনেককেই ঐরূপ বলিতে শুনা যায়। ইতিপূর্ব্বে রামমোহন আপনাপনি সামান্যরূপ ইংরাজী শিক্ষা করিয়াছিলেন। এক্ষণে, কার্য্যোপলক্ষে, অনেক সময়, ইংরাজদিগের সহিত, তাঁহাকে থাকিতে হইত। কার্য্য-কুশল রামমোহন এই সুযোগে ইংরাজী ভাষা এক প্রকার আয়ত্ত করিয়া লন। তৎকালে আমলাগণ প্রধানতঃ অতিনীচ সমাজ হইতেই গৃহীত হইত। যে প্রকারেই হউক উপরওলাকে সন্তুষ্ট রাখিয়া দুই পয়সা রোজগার করাই তাহাদের রীতি ছিল। ইংরাজ রাজপুরুষগণ কাজেই সেইরূপ লোককেই সে সময়ে পাইতেন। উচ্চ সমাজ ভুক্ত লোক তাঁহাদের নিকট অতি বিরল ছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সুতরাং মেকলে প্রভৃতি যে এদেশীয়দিগকে ওরূপ পবিত্র ভাবে চিত্রিত করিবেন তাহার আর বিচিত্র কি! * যাহা হউক রামমোহন রায়ের কথা স্বতন্ত্র। তিনি প্রগাঢ় অর্থ পিপাসা পরিতৃপ্তি লালসায় এরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হন নাই। মাতা পিতা কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া তিনি অনন্যোপায় হইয়া পড়েন। কেবল আপনার ও পরিবারবর্গের গ্রাসাচ্ছাদনই তাঁহার একমাত্র লক্ষ্য ছিল। তিনি যেরূপ অবস্থায় পড়িয়া চাকরী স্বীকার করেন অন্যে সেরূপ অবস্থায় পড়িলে বোধ হয়

---

* কিন্তু এস্থলে ইহাও উল্লেখ কর্ত্তব্য যে কোন সমাজের বিশিষ্ট সম্প্রদায় ভুক্ত লোক না দেখিয়া তাহাদের সম্বন্ধে আপনাপন অভিপ্রায় ব্যক্ত করা যুগপৎ সভ্যতা ও ধর্ম্ম বিগর্হিত কার্য্য।

লোক বিশেষের পদ লেহন বা পাদুকা বহনেও ক্রটী করিতেন না। কিন্তু মহাভাগ রামমোহন কি উপায়ে আপন মর্য্যদা রক্ষা করিয়া ছিলেন তাহা তদানীন্তন রংপুরের কালেক্‌টার মিষ্টর যন ডিগ্‌বীর সহিত তাঁহার কড়ার পত্র পাঠ করিলেই সম্যক অবগত হওয়া যায়। সর্ব্বপ্রথম যখন তিনি ডিগ্‌বীর অধীনে কেরাণী-গিরী পদে নিযুক্ত হন তখন তাঁহার সহিত রামমোহনের এইরূপ ভাবে একটা লেখাপড়া হয় যে তিনি (রামমোহন) কালেক্‌-টারের সম্মুখে কখনই দণ্ডায়মান থাকিবেন না বা সামান্য কোন আমলার ন্যায় হুকুম তামিল করিবেন না। কিন্তু কালের গতি কে বলিতে পারে? ডিগ্‌বী কি তখন জানিতেন যে ভবিষ্যতে তাঁহার এই আমলা ইয়োরোপীয় রাজকুলের নিকট মহামান্য সহকারে সংপূজিত হইবেন?

১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়। অতঃপর সকলেই অনুমান করিলেন এবার বুঝি রামমোহন, ঔদ্ধত্যভাব ত্যাগ করিয়া, সাংসারিক কার্য্যে মনোযোগী হইবেন। কিন্তু তাঁহাদের সে অনুমিত জলবিম্ব জলেই মিশাইয়া গেল। রামমোহন পবিত্রপূর্ণ জ্যোতিঃ নিরীক্ষণ করিয়াছেন, অপূর্ব্ব ব্রহ্মানন্দ রসে আপ্লুত হইয়াছেন, আর কি তিনি নিবিড় তমোময় পথে প্রত্যাবৃত্ত হন। এই সময়, রামমোহন, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির রঙ্গপুরের দেওয়ানী পদ পরিত্যাগ করিয়া, দ্বিগুণতর অধ্যবসায় ও যত্ন সহকারে, পবিত্র কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। কি দেশীয়, কি বিদেশীয, রামমোহন, এই সময়, ধর্ম্ম মাত্রেরই আভ্যন্তরিক কুসংস্কার সম্বন্ধে গ্রন্থ প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। বলা বাহুল্য যে একারণ তাঁহার প্রতি সকলেই শত্রুভাব ধারণ

করিয়াছিল। কেবল তাঁহার স্কটলণ্ড দেশীয় দুই তিনটী বন্ধু তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন নাই। রামমোহন তাঁহার গর্ডন নামক জনৈক বন্ধুকে আপন জীবনী সম্বন্ধে যে এক পত্র লিখেন তাহাতে স্কট্‌লাণ্ড দেশীয়গণের প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছিলেন। *

স্বধর্ম্ম-প্রচারোপলক্ষে অতঃপর রামমোহন রাধানগর পরিত্যাগ করিয়া মুরশিদাবাদ গমন করেন।

এস্থলে ইহাও উল্লেখ আবশ্যক যে রায় বংশ বহু বিস্তৃত হওয়ায় অগত্যা ফুলঠাকুরাণী রাধানগরের সন্নিকট লাঙ্গলপাড়া নামক গ্রামে আসিয়া বাস স্থাপন করেন। ইহার কয়েক বৎসর পরে রামমোহনের অপর দুই ভ্রাতা কালগ্রাসে পতিত হন। এদিকে রামমোহনের ত এই গতিক। বিশেষতঃ তিনি আবার ত্যজ্য পুত্র। প্রচলিত আইনানুসারে যদিও তিনি পিতৃধনের সম্পূর্ণ অধিকারী, তথাপি পার্থিব সুখে বীতরাগ, বিনয়ী রামমোহন আত্মীয় স্বজনের মনে কষ্ট দিয়া স্বহস্তে সকল গ্রহণ করিতে বিরত হন। মাতার এরূপ ব্যবহারেও তিনি তাঁহার প্রতি কখন অণুমাত্র ক্ষুণ্ণ হন নাই এবং তাঁহার মাতৃভক্তি বরাবর সমভাবে ছিল। রংপুর হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া রামমোহন সর্ব্ব প্রথম মাতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। রামমোহন আসিতেছেন শুনিয়া তিনি মহা কুপিত হইয়া তাঁহার প্রতি

---

* * * That I was at last deserted by every person except two or three Scotch friends, to whom, and the nation to which they belong, I always feel grateful. R. M. R.

নানারূপ তিরস্কার আরম্ভ করেন। তিনি রামমোহনের মুখ দর্শন কি তাঁহাকে স্পর্শ করিবেন না, অথচ পুত্র মাতার পদধূলি লইতে ছাড়িবেন না। অপূর্ব্বদৃশ্য! রামমোহনকে এইরূপ স্থিরপ্রতিজ্ঞ দেখিয়া ফুলঠাকুরুণ বলিলেন "যদি আমাকে স্পর্শ করিবার তোমার নিতান্তই বাসনা থাকে তবে অগ্রে আমার গৃহ দেবদেবী রাধা গোবিন্দপদে প্রণাম করিয়া আইস।" মাতৃবৎসল রামমোহন তৎক্ষণাৎ তাহাই শিরোধার্য্য করিয়া ঠাকুরগৃহে গমন করিলেন এবং "আমার মাতার দেবদেবীকে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিতেছি।" এই বলিয়া রাধাগোবিন্দকে প্রণাম করিয়া আসিলেন। মাতার মনে পাছে কোন বিষয়ে কষ্ট হয়, একারণ তিনি সর্ব্বদাই সশঙ্কিত থাকিতেন। অতি সামান্য বিষয়ে পর্য্যন্ত তিনি দৃষ্টি রাখিতেন। জগন্মোহন রায়ের পুত্র গোবিন্দপ্রসাদকে তিনি রূপার পাত্রে আহার দেওয়াইতেন এবং আপন পুত্র রাধাপ্রসাদের জন্য সামান্য পাত্র নির্দ্দিষ্ট ছিল

এই সময় হইতে কিছু দিন তাঁহার মাতা তাঁহার উপর সন্তুষ্ট থাকেন। কিন্তু রামমোহন সুস্থির থাকিবার লোক নন, তিনি আপন অভীষ্ট পথে ক্রমেই অগ্রসর হইতেছেন। এই সময় তিনি পৌত্তলিকধর্ম্ম সম্বন্ধে নানারূপ গ্রন্থ রচনা ও তর্ক বিতর্ক আরম্ভ করেন। রামমোহনের এবম্বিধ ক্রিয়া কলাপ দর্শনে ফুলঠাকুরুণ পুনরায় মর্ম্মান্তিক ক্রুদ্ধ হইলেন এবং রামমোহনের নব পুত্রবধূ ও বধূদ্বয়কে আপন আবাস হইতে একেবারে বহিষ্কৃত করিয়া দিবার সঙ্কল্প করেন। এই সম্বন্ধে একটী গল্প এ স্থলে বিবৃত হইতেছে। শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন চিকিৎসকের আদেশানুসারে একদা

রামমোহন ছাগমাংসের সুরুয়া প্রস্তুত করিয়া পান করেন। কোন সুযোগে ফুলঠাক্রুণ তাহা দেখিতে পাইয়া মহাগোলযোগ আরম্ভ করেন এবং স্বয়ং রায় বংশস্থ সকলের বাটী গিয়া এই বলিয়া আসিলেন যে "তোমরা সকলে সতর্ক হও, রামমোহন খ্রীষ্টান হইয়া ঘরে থাকিয়া কুখাদ্য আরম্ভ করিয়াছে। চল, সকলে মিলিয়া তাহাকে ভিটা হইতে বাহির করিয়া দেই। সর্ব্বনাশ আরম্ভ হইয়াছে।" যাহা হউক রামমোহন জননীর এ প্রকার আচরণে অণুমাত্র ক্ষুণ্ণ না হইয়া মাতার বাটীর সন্নিকট কোন একস্থানে বাস করিবার মানস করেন। কিন্তু সমস্ত কৃষ্ণনগর মাতার অধিকার ভুক্ত, তিনি হিন্দু-ধর্ম্মদ্বেষী ত্যজ্য পুত্রের জন্য কেনই বা বাসোপযোগী ভূমি দান করিবেন। ফুলঠাকুরাণী তখন একমাত্র পুত্র রামমোহনকে কৃষ্ণনগর হইতে একেবারে দূরীকৃত করিবার অভিলাষী হন; কিন্তু তাঁহার সে অভিলাষ পূর্ণ হয় নাই। রামমোহন জন্মভূমি পরিত্যাগে অনিচ্ছুক হইয়া মাতার বাটীর সন্নিকট রঘুনাথপুর নামক গ্রামে অগত্যা এক সুবিস্তীর্ণ শ্মশান ভূমির উপর বাস স্থাপন করেন এবং বাটীর সম্মুখ ভাগে একটী মঞ্চ নির্ম্মাণপূর্ব্বক—"ওঁ তৎসৎ একমেবাদ্বিতীয়ং" কয়েকটী অক্ষর তাহার চতুঃপার্শ্বে খোদিত করেন। সেই স্থানটী ভারতীয় ধর্ম্ম-সংস্কারকের ত্রিসন্ধ্যা উপাসনার স্থান ছিল। তিনি কলিকাতা হইতে বাটী গমন করিয়া এবং প্রত্যাবৃত্ত হইবার কালীন উল্লিখিত মঞ্চটী সর্ব্বাগ্রে প্রদক্ষিণ করিতেন। অদ্যাপিও উহার ভগ্নাবশেষের কতক কতক তদীয় রঘুনাথপুরের বাটীতে দেখিতে পাওয়া যায়। এই মঞ্চটী দেখিয়া একদা তদীয় কনিষ্ঠা স্ত্রী উমা দেবী কথায় কথায় তাঁহাকে

জিজ্ঞাসা করেন যে, "কোন্ ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ" ? রামমোহন উত্তর করেন "গাভী সকল নানা বর্ণের, কিন্তু দুগ্ধ সকলের একবর্ণ—নানা মুনির নানা মত, অতএব সত্য পথ আশ্রয় করাই সকল ধর্ম্মের সার ধর্ম্ম।" তৎকৃত ও অনুমোদিত ব্রহ্মসঙ্গীত মাত্রেরই শেষে "সত্য আশ্রয় কর" ইত্যাদি কথা প্রতিভাত হইতেছে।

রামমোহনের এই নব-নির্ম্মিত বাটীতে তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন। জ্যেষ্ঠের বয়ঃক্রম তখন আঠার বৎসর।*

অতঃপর জমীদারী কার্য্যনিচয় সকলই পূর্ব্বের ন্যায় তখনও তাঁহার মাতার অধীনে রহিল। তিনি জমীদারী কার্য্য প্রভৃতি স্বহস্তে গ্রহণ করিয়া অতি সুচারুরূপ কার্য্য সম্পাদন করিতে লাগিলেন। এ দেশীয় জমীদারী কার্য্য সকল যেরূপ জটিল ও তাহাতে যেরূপ সূক্ষ্ম বুদ্ধির প্রয়োজন-তাহাতে স্ত্রীলোকের কথা দূরে থাকুক অনেক সময় কত পুরুষকে ব্যতিব্যস্ত হইতে হয়। এরূপ অবস্থায় একটী বঙ্গীয়া স্ত্রীলোকের পক্ষে বিধিমত কার্য্য সম্পাদন কতদূর কঠিন বিষয় বলা যায় না। কথিত আছে, ফুলঠাকুরাণী গৃহ-দেবদেবী রাধাগোবিন্দ ও অনেকগুলি শালগ্রাম সম্মুখে রাখিয়া জমীদারী কার্য্য সকল পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। রাম-মোহন এই সময় কলিকাতায় আসিয়া একটী বাসস্থান নির্ম্মাণ করেন।† এবং তাঁহার জন কয়েক স্ববংশীয় তাঁহার সহিত যোগ দেন।

---

* রামমোহনের মধ্যমা স্ত্রী শ্রীমতী দেবীর গর্ভে তাঁহার দুই পুত্র জন্মে-রাধাপ্রসাদ ও রমাপ্রসাদ। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে রাধাপ্রসাদের জন্ম হয়।

† অনুমান ১৮১৫ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে।

তাঁহার স্বজন মধ্যে সর্ব্বপ্রথম তদীয় ভাগিনা গুরুদাস মুখোপাধ্যায় ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হন। রামমোহন তাঁহাকে প্রগাঢ় স্নেহ করিতেন। গুরুদাস মুখোপাধ্যায় কতকটা উদ্ধত প্রকৃতির লোক ছিলেন-কোনরূপ অন্যায় ব্যবহার তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। রামমোহনের প্রতি তিনি অতিশয় অনুরক্ত ছিলেন। একদা কোন লোক রামমোহনের নামে একটা অশ্রাব্য গীত রচনা করে। নিম্নে তাহার আস্থায়ীটী মাত্র দেওয়া গেল; অবশিষ্টাংশ অতীব অশ্লীল ও শ্রুতি-কটু—"জেতের নিকেস, রামমোহন রায়, বিদ্যের নিকেস করেছে—হদ্দ এক নিকেসের ফর্দ্দ উঠেছে" ইঃ—গুরুদাস তাহা জানিতে পারিয়া ঐ ব্যক্তিকে বিশেষরূপ শিক্ষা দিতে কৃতসংকল্প হন। রামমোহন কোন সুযোগে তাহা শুনিতে পাইয়া গুরুদাসকে আপন সন্নিধানে ডাকাইয়া পাঠান। গুরুদাস তখন ক্রোধে কম্পিত কলেবর, রামমোহন তাঁহাকে নানারূপ উপদেশ দিয়া বলিলেন "দেখ ইংরাজেরা কত শত ভয়ানক বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া তবে ভারত অধিকারে কৃতকার্য্য হন। আর বিশেষ জানিবে যে বিপদ সম্পদের মূল, যন্ত্রণা সুখের পথ প্রদর্শক—আলোকময় পথে সহজেই যাওয়া যায়, কিন্তু অন্ধকার উত্তীর্ণ হইয়া যিনি যাইতে পারেন তিনিই মহৎ নামের উপযুক্ত। যে যাহা বলুক্ না কেন তাহা শুনিবার প্রয়োজন কি আপন পবিত্র অভীষ্ট পথ হইতে বিচ্যুত না হইলেই হইল।" গুরুদাস এই সকল কথা শুনিয়া ওরূপ কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হন।

রামমোহনের তিন বিবাহ। প্রথমে তিনি বর্দ্ধমানের অন্তঃপাতী কুড়মন পলাশী নামক গ্রামে বিবাহ করেন। অতি অল্প

বয়সেই তাঁহার জ্যেষ্ঠাস্ত্রী কালগ্রাসে পতিত হন। তৎপরে পিত্রাজ্ঞানুসারে পুনরায় তিনি দারপরিগ্রহ করেন। শেষ বিবাহ রামমোহন আপন ইচ্ছা মতে করিয়া ছিলেন।* এস্থলে তাঁহাকে অনেকেই বহু বিবাহের সপক্ষ বলিয়া মনে করিতে পারেন। কিন্তু তিনি সে বিষয় হইতে অনেক দূরে ছিলেন। তিনি সকল প্রকার কুসংস্কারেরই সংশোধনে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু যথা সময় না হইলে আপনার সম্বন্ধে কে কি করিতে পারে? রামমোহনের হয়ত সে সময় প্রকৃত আত্মজ্ঞান কাল উপস্থিত হয় নাই। মধ্যমাস্ত্রী শ্রীমতী দেবীর বর্ত্তমানে তিনি আপন ইচ্ছায় পুনরায় বিবাহ করিয়া বিশেষ লজ্জিত থাকেন। পাছে মধ্যমা ঠাকুরাণী সম্বন্ধে, সামান্য বিষয়ে ও কোন ত্রুটী হয় একারণ সর্ব্বদাই তিনি সশঙ্কিত থাকিতেন। বাটীর ভিতর যখন যাইতেন তখন উভয় স্ত্রীই তাঁহার নিকট আসিলে তিনি শ্রীমতী দেবীর প্রতি লক্ষ্য করিয়া সহাস্যে দাসীদিগকে বলিতেন '-অগ্রে পুত্রবতীকে আসন আনিয়া দাও।" তৎপরে উভয় স্ত্রী ও বাটীর অপরাপর স্ত্রীলোকেরা উপবিষ্ট হইলে সর্ব্বশেষে আপনি আসন পরিগ্রহ করিতেন। যাহা হউক তিনি বহু বিবাহের বিপক্ষে গবর্ণমেণ্টে এক দরখাস্ত প্রেরণ করেন। প্রসিদ্ধ মিষ্টার বিটন তাহাতে আপত্তি করিয়া বলেন যে "ওরূপ করিলে হিন্দুদিগের ধর্ম্মের উপর আমাদের হস্তক্ষেপ করা হয়।" সুতরাং গভর্ণমেণ্ট সে বিষয়ে আর কিছু করেন নাই। ইহার কিছুদিন পরে বিটনসোসাইটি স্থাপিত হয়।

---

* তাঁহার কনিষ্ঠা স্ত্রী উমা দেবীর পিত্রালয় কলিকাতার অন্তর্গত ভবানীপুর। ইনি ৬ মদনমোহন চট্টোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠা ভগিনী।

মিষ্টার বিটন তখন প্রকাশ্য সভায় বলেন "যে বহুবিবাহসম্বন্ধে রাজা রামমোহন রায়ের দরখাস্তের বিপক্ষে কার্য্য করিয়া আমি যে পাতক করিয়াছি, এই বিটনসোসাইটী প্রতিষ্ঠা করিয়া অদ্য তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিলাম।" আশ্চর্য্যের বিষয় রামমোহনের বিপক্ষে যাঁহারা ছিলেন, কিছুদিন পরে কোন না কোনরূপে তাহাদের প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে।

রামমোহন সম্বন্ধে সমাজ লইয়া যেরূপ গোল হয় তাহার কতকটা এস্থলে দেওয়া যাইতেছে। বলা বাহুল্য যে রামমোহন পবিত্র ধর্ম্মধ্বজা উত্থিত করিয়া অধুনাতন হিন্দুসমাজে পতিত হইয়াছিলেন। এদেশের অবনতির একটী প্রধান কারণ দলাদলি। এই দলাদলির গোলে পড়িয়া কত লোককে কত যন্ত্রণা কত কষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছে বলা যায় না। কৌলীন্যপ্রথা যেমন মঙ্গলাশায় প্রবর্ত্তিত হয়, দলাদলিরও সেইরূপ সদভিপ্রায় ছিল। দলাদলির অপরার্থ সমাজশাসন। সমাজস্থ কোন ব্যক্তি কোন অন্যায় কার্য্য করিলে তাহাকে সম্যক্ শিক্ষা দেওয়াই দলাদলির মুখ্য উদ্দেশ্য। কৌলীন্য ও দলাদলির এরূপ সদভিপ্রায় থাকিলেও কালের মাহাত্ম্যগুণে অথবা ভারতের মৃত্তিকা দোষে সকলেই বিপরীত ভাব ধারণ করিয়াছে। দেশের ত এই গতিক, এ অবস্থায় এ দেশে একতার অবস্থান কেবল বাক্যেই পরিণত হইয়া থাকে। অধুনাতন প্রকৃষ্ট সমাজবিশেষে যদিও এ সকল ঘৃণেয় ব্যাপার অতি বিরল। কিন্তু রামমোহনের সময় মনে হইলে হৃৎকম্প উপস্থিত হইয়া থাকে। দলাদলির প্রভাবে তাঁহার জীবন লইয়া টানাটানি পড়িয়াছিল। সনাতন ব্রাহ্মধর্ম্মে যোগ দেওয়া ত দূরের কথা, ব্রাহ্মসমাজে

প্রবেশ করিলেও লোকে সে সময়ে জাতিভ্রষ্ট হইত। কিন্তু কে কোথা দেখিয়াছে যে শিথিল বালির বাঁধ নদীর গতিরোধে সমর্থ হইয়াছে? সে সময়ে এমন কে ছিল যে, রামমোহনকে নিরস্ত করিতে পারে?

কৃষ্ণনগরের সন্নিকট রামনগর গ্রাম নিবাসী রামজয় বটব্যাল নামক এক ব্যক্তি চারি পাঁচ সহস্র লোক লইয়া একটা দল করে। কথিত আছে এই ব্যক্তি রামমোহনকে বড়ই বিব্রত করিয়া তুলিয়াছিল। ইহাদের, রামমোহন রায়ের উপর আক্রমণই প্রধান কার্য্য ছিল। অতি প্রত্যূষে ইহারা তাঁহার বাটীর সম্মুখে আসিয়া অবিরত কুক্কুট ধ্বনি করিত ও সন্ধ্যাকালে গোহাড় প্রভৃতি তাঁহার অন্তঃপুর মধ্যে প্রক্ষেপ করিয়া নানাবিধ অত্যচার করিত। রামমোহন ইহাদিগকে ওরূপ অন্যায় কার্য্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য অনেক সদুপদেশ প্রদান করেন "কিন্তু চোরা না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী" তাহারা তাঁহার বিনয় নম্রতার বিভিন্ন চিত্র লইয়া বরং পূর্ব্বাপেক্ষা আরও অধিকতর রূপে দৌরাত্ম্য আরম্ভ করে। তাহাদের এত অত্যাচারেও রামমোহন আর দ্বিরুক্তি করেন নাই। বিনয়ের কি অনির্ব্বচনীয় প্রভাব! পরিশেষে তাহারা " বোবার শত্রু নাই" ভাবিয়া নিরস্ত হইয়াছিল। নেপোলিয়ন সুতীক্ষ্ণ অসি লইয়া দেশ জয় করেন—রামমোহন ধৈর্য্যাস্ত্র প্রভাবে লোকের হৃদয় জয় করিয়াছিলেন। এসময় তিনি নানা বিষয়ে বড়ই ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়েন। জগন্মোহন রায়ের পুত্র গোবিন্দপ্রসাদ অন্যান্য লোকের প্ররোচনায় বিষয়ের হিস্যা পাইবার জন্য তাঁহার নামে সুপ্রীম্‌কোর্টে এক অভিযোগ উপস্থিত করেন কিন্তু

ইহাতেও তিনি ক্ষণকালের জন্য ভ্রাতুষ্পুত্রের প্রতি রুষ্ট হন নাই। পরিশেষে অভিযোগ সম্বন্ধে ক্ষমাপ্রার্থনা করিয়া গোবিন্দ-প্রসাদ তাঁহাকে যে পত্র লিখেন তাহার অবিকল প্রতিলিপি নিম্নে প্রকটিত হইল।

শরণং।

সেবক শ্রীগোবিন্দপ্রসাদ দেবশর্ম্মণঃ।

প্রণামা পরাৰ্দ্ধ নিবেদনঞ্চ বিশেষঃ মহাশয়ের শ্রীচরণ প্রসাদাৎ এ সেবকের মঙ্গল পরং আমি অন্য২ লোকের কথা প্রমান মহাশয়ের নামে হিস্যা পাইবার প্রার্থনায় শুপরেম কোর্টে একুইটীতে অজথার্থ নালিশ করিয়াছিলাম এক্ষণে জানিলাম যে আমার বুঝিবার ভ্রমে এ বিষয়ে প্রবর্ত্ত হইয়া নানাপ্রকার ক্লেশ পাইতেছি এবং মহাশয়ের ও মনস্তাপ এবং অর্থব্যয় অতএব মহাশয় আমার পিতার তুল্য আমার অপরাধ মর্য্যাদা করিয়া জদি আমাকে নিকট জাইতে অনুমতি করেন তবে আমি নিকট পোঁছিয়া সকল বিশয় নিবেদন করি শ্রীচরণাম্বুজেষু ইতি।

সন ১২২৬ সাল তাং ১৪ কার্ত্তিক।

পরম পূজনীয় শ্রীযুৎ রামমোহন রায় খুড়া মহাশয়
শ্রীচরণ-সরজেষু।

পত্র দেনা মোং কলিকাতা।

রামমোহনের জ্যেষ্ঠ পুত্র রাধাপ্রসাদের বিবাহে জাতি লইয়া এক মহাগোল উপস্থিত হয়। কিন্তু রামমোহনকে জাতি-ভ্রষ্টের ভয় দেখাইয়া দমন করিতে যাওয়া ধৃষ্টতা মাত্র। প্রথমতঃ কৃষ্ণনগরের সন্নিকট লাউসর নামক এক গ্রামে সম্বন্ধ স্থির হয়। বিপক্ষদল কোন সুযোগে তাহা জানিতে পারিয়া বিশিষ্টরূপ বাধা দিয়াছিল। সুতরাং সে সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া যায়। যাহা হউক পরিশেষে মেদিনীপুর জেলার অন্তঃপাতী ইড়পালা গ্রাম নিবাসী জনৈক বর্দ্ধিষ্ণু ব্যক্তি রামমোহনের বিদ্যা বুদ্ধির পরিচয় পাইয়া রাধাপ্রসাদকে আপন কন্যা সমর্পণে স্বীকৃত হন। অতঃপর মহা সমারোহে উদ্বাহ ক্রিয়া সম্পন্ন হইল। বিপক্ষ দল ভাবিয়াছিল যে রামমোহনের ও তাঁহার আশ্রিত জন কয়েকের মধ্যে আদান প্রদান বন্ধ করিবে; কিন্তু সকলই নিষ্ফল হইল। ইহাতে বিপক্ষ দলের আর দুঃখের সীমা পরিসীমা ছিল না। তাহাদের হিংসা ও বিদ্বেষ হয়ত রামমোহনের নামে "সুরাই মেলের কুল, তার বাড়ী খানাকুল, ওঁতৎসৎ বলে দিয়ে কচ্চে হুলুস্থুল" এইরূপ দুই একটি গীত রচনাতে পরিণত হইয়াছিল। নীচ লোকের ইহা ব্যতীত গাত্রদাহ নিবারণের আর উপায় কি? এখন সমাজের সেরূপ দুরূহ ভাব বড় একটা নাই—এখন অনেকটা ভারত সংস্কৃত হইয়া আসিয়াছেন, বিজ্ঞানের প্রভাবে জ্ঞানের উচ্চ সোপানে অধিরোহণ করিতেছেন। অজাতশ্মশ্রু একটি বালকও দর্শন বিজ্ঞান লইয়া আজ কাল মহা ব্যতিব্যস্ত। বিজ্ঞান-সভা, সংস্কারকসভা, স্ত্রীশিক্ষাসভা ভারতপঙ্কোদ্ধারে রত অতঃপর আর ভাবনা কি?*

* আমরা একথা বলিনা যে ইতিমধ্যে অবনতি দেবী বিরাজ করিতেছেন।

কিন্তু কি পরিতাপের বিষয় যে ইহার ভিতর প্রকৃত কার্য্য অতি অল্পই দেখা যায়। ভারতের ভাব চিরকালই পরিবর্ত্তনশীল; এখন আবার অপর রূপ ভাব ধারণ করিয়াছে—এখন স্বেচ্ছাচার ও অম্মাভিমানে সকলে পরিপূর্ণ। স্বজাতিপ্রেম, একতা এ সকলের নাম গন্ধও নাই। এতদুভয়ের সমষ্টি যাহা সংশোধনে সমর্থ শত দর্শন শত বিজ্ঞানের সাধ্য নাই যে তাহার শতাংশের একাংশও সাধন করিতে পারে। একথা কোন্ সহৃদয় না স্বীকার করিবেন? রামমোহন রায় বলিতেন— ধর্ম্মই সকল উন্নতির দ্বারস্বরূপ—আত্মানুসন্ধান কর ও ধর্ম্মের অনুগামী হও কোন অভাবই থাকিবে না। তিনি কত কষ্ট কত যন্ত্রণাভোগ করিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই, কিন্তু একমাত্র বিশ্বাস ও ধর্ম্মের বলে তিনি সকল কার্য্যক্ষেত্রেই বিজয় লাভ করিয়া গিয়াছেন। কত ঝড় কত স্রোত তাঁহার উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে কিন্তু মহাবল রামমোহন সকল সময়েই সমভাবে ছিলেন, কিছুতেই তাঁহার অটল ভাব তিরোহিত হয় নাই। "আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন।" পরিতাপের বিষয় ধর্ম্মবন্ধন এখন অতীব শিথিল হইয়া পড়িয়াছে—বিশ্বাস পলায়নপর—নাস্তিকতার অধিকার, এমন অবস্থায় দেশের উন্নতি কামনা বিড়ম্বনা মাত্র।

একদা কোন ব্যক্তি নাস্তিকতা সম্বন্ধে কয়েকটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসু হইয়া রামমোহনের নিকট উপস্থিত হন। তৎসম্বন্ধে রামমোহন তাহাকে সহজ কথায় যাহা বলিয়াছিলেন তাহা নিম্নে বিবৃত হইতেছে—ইহা অবশ্য স্বীকর্ত্তব্য যে এক অভাবনীয় তেজ হইতে সকল উৎপন্ন—এই তেজের অংশ অবশ্যই সকলেতে

কিছু না কিছু গূঢ়রূপে অবস্থান করিতেছে। মনুষ্যকৃত জগতে অনেকানেক অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার দেখা যায় কিন্তু মনুষ্য যে তেজের মূল হইতে উৎপন্ন, সেটী কিরূপ তাহা বর্ণনাতীত। প্রশ্নকর্ত্তা পুনরায় জিজ্ঞাসা করেন—ভাল তাহাই স্বীকার করিলাম কিন্তু সে তেজকে জানিবার উপায় কি? উত্তর—অগ্রে আপনাকে জানিতে চেষ্টা করিলে তবে সেই তেজের কতক পরিচয় পাওয়া যায়—আপনাকে না জানিয়া সে তেজকে জানিতে যাওয়া ধৃষ্টতা মাত্র। তবে এই মাত্র জানা যায় যে সে তেজ জ্ঞানময়—কেন না সৃষ্ট মাত্রেই নিগূঢ়ভাবে পূর্ণ—মনুষ্যের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পরীক্ষায় স্পষ্টই প্রতীত হয় যে দেহের প্রত্যেক অংশে কারণ দেদীপ্যমান রহিয়াছে। সুতরাং মূলতেজ জ্ঞানময়। অতঃপর প্রশ্নকর্ত্তা পরম আহ্লাদিত হইয়া পবিত্র ধর্ম্মে দীক্ষিত হন।

যখন হিন্দু কলেজ-সংস্থাপনের প্রস্তাব হয়, তখন স্বদেশহিতৈষী রামমোহন অত্যন্ত আহ্লাদের সহিত তাহাতে যোগ দেন, কিন্তু তাঁহার কতকগুলি স্বদেশীয় তাঁহার উপর বিদ্বেষবশতঃ বিষম আপত্তি আরম্ভ করিলে, রামমোহন রায় তাহাতে অণুমাত্র ক্ষুণ্ণ না হইয়া কলেজ কমিটি হইতে অপসৃত হইতে প্রস্তুত হইলেন। তিনি কমিটির মধ্যে থাকুন বা নাই থাকুন তাহাতে তিনি কিছুমাত্র ক্ষতি মনে করেন নাই। এদেশে একটি বিশ্ববিদ্যালয় সংস্থাপিত হউক ইহাই তাঁহার আন্তরিক ইচ্ছা ছিল। রামমোহন রায় তদানীন্তন ভারতবর্ষের গভর্ণর জেনারেল লর্ড আমহর্ষ্টকে এ দেশের শিক্ষা বিষয়ে যে পত্র লিখেন তাহা দেখিয়া স্পষ্টই প্রতীত হয় যে হিন্দু কলেজ ও

আদি ব্রাহ্মসমাজের ন্যায় তাঁহার অধ্যবসায় ও যত্নের একটি সুমহৎ ফল।

রামমোহনের এই অবস্থার কিছু দিন পরে তাঁহার মাতা তাঁহার সহিত পুনর্ম্মিলিত হন এবং তাঁহাকে বিশেষ বুঝাইয়া বলেন যে "তোমার প্রতি আমি যতদূর পারি কুব্যবহার করিয়াছি, এক্ষণে জানিলাম যে তোমার পথই সত্য। কিন্তু এতকাল একভাবে থাকিয়া এক্ষণে কোন ক্রমে তোমার সহিত প্রকাশ্যে মিশিতে পারি না। অতএব যত শীঘ্র পার আমায় শ্রীক্ষেত্রে পাঠাইয়া দাও, তোমার ধর্ম্ম তথায় পালিত হইবে।" রামমোহন জননীর এবম্প্রকার বাক্যে পরম পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে তীর্থোপযোগী সমুদায় ব্যবস্থা করিয়া দেন। একবৎসরকাল জগন্নাথক্ষেত্রে বাস করিয়া তিনি তথায় মানবলীলা সম্বরণ করেন। তৎকালে রামমোহন পুত্রদ্বয় লইয়া প্রায় কলিকাতার বাটীতেই থাকিতেন। এই সময় বিদ্যানুশীলনই তাঁহার প্রধান বৃত্তি ছিল। সময়ে সময়ে বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীদিগের সহিত তাঁহাকে ধর্ম্ম-যুদ্ধেও প্রবৃত্ত থাকিতে হইত। সহমরণ প্রথা উঠাইবার জন্য এই সময় তাঁহাকে কি স্বদেশীয় কি বিদেশীয় সকলেরই সহিত তুমুল সংগ্রাম করিতে হয়। পরিশেষে রামমোহন জয়ী হন এবং এই লোমহর্ষণ ব্যাপার জন্মের মত ভস্মীভূত হইয়া যায়। সহমরণ সম্বন্ধে তাঁহার পরিবার মধ্যে যে একটি বিশেষ ঘটনা ঘটে তাহা এস্থলে বিবৃত হইল। তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর জগন্মোহন রায়ের মৃত্যু হইলে পর তদীয় স্ত্রী সহমৃতা হন। রামমোহন তাঁহাকে এরূপ অধ্যবসায় হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য অনেক অনুনয় করেন। কিন্তু তিনি কিছুতেই

সম্মত হইলেন না। স্বামী এবার আর রোগশয্যা হইতে উত্থিত হইবেন না, ইহা জানিয়া তিনি পূর্ব্ব হইতেই সকল যোগাড় করিয়া রাখিয়াছিলেন। এই ঘটনার অল্প দিন পরে তাঁহার গ্রামস্থ অপর একটি স্ত্রীলোকও সহমৃতা হন। তিনি অর্দ্ধ দগ্ধশরীরে চিতা হইতে উত্থান করিয়া যেরূপ ভয়ঙ্কর কাণ্ড করেন ও আত্মীয় স্বজন কর্ত্তৃক নিষ্ঠুররূপে দগ্ধীভূত হন তাহা শুনিলে হৃৎকম্প উপস্থিত হইয়া থাকে। যাহা হউক রামমোহন এই দুইটি হৃদয়-বিদারক ব্যাপার দর্শনে মর্ম্মে আঘাত পাইয়াছিলেন। এই সময় হইতে সহমরণ প্রথার মূলোৎপাটনে তিনি বদ্ধ-পরিকর হন। অনন্তর কলিকাতায় প্রত্যাগত হইয়া রামমোহন সহমরণ প্রথার বিরুদ্ধে এক গ্রন্থ রচনা করেন। তখন ভারত-হিতৈষী মহাত্মা লর্ড বেন্‌টীঙ্ক ভারতবর্ষের শাসন-কর্ত্তা ছিলেন। তাঁহারও ভারত হইতে এই হত্যাকাণ্ড অপনীত করিবার সঙ্কল্প থাকে। এক্ষণে তিনি সময় বুঝিয়া রামমোহনের সহিত এ বিষয়ের পরামর্শ করিবার জন্য তাঁহাকে আপন সমীপে লইয়া আসিতে জনৈক পারিষদ প্রেরণ করেন। রামমোহন বড় একটা রাজদরবারী কিম্বা রাজ-মুখাপেক্ষী লোক ছিলেন না। তিনি ভাবিতেন আপন কার্য্য আপন অঙ্গুষ্ঠের মধ্যে, কার্য্যক্ষেত্রে সযত্নে বীজ বপন করিলে কখনই নিষ্ফল হইবার নয়। আশ্চর্য্যের বিষয় যে, যে কার্য্যেই এই মহাত্মার হস্ত পড়িয়াছে তাহা প্রায় কোন না কোন প্রকারে ফলশালী হইয়াছে। যাহাহউক তিনি অতি বিনয় সহকারে রাজ-দরবার গমনে অস্বীকার করেন। লর্ড বেন্‌টীঙ্ক সমস্ত অবগত হইয়া স্বয়ং তাঁহার নিকট উপস্থিত হন। বলা বাহুল্য যে এই উভয়

ভারত-হিতৈষীর একত্র মিলনের ফল ভারত হইতে নারী-হত্যার চির উচ্ছেদ।

এই ঘটনার কয়েক বৎসর পরে রামমোহনের মধ্যমা স্ত্রী পরলোক গত হন। পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে রামমোহন পুত্রদ্বয় লইয়া কলিকাতার বাটীতে থাকিতেন। কনিষ্ঠ পুত্রের বয়ঃক্রম তখন আট বৎসর মাত্র।

দাহসম্বন্ধে আজ কাল ইয়োরোপ প্রভৃতি সুসভ্য জনপদে অনেক তর্কবিতর্ক চলিতেছে। সে সকল বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপ সমালোচনা এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নয়, তবে এদেশের দাহপ্রণালী যেরূপ তাহা নিতান্ত হৃদয়বিদারক। স্নেহময়ী মাতা, পরম শ্রদ্ধাবান পিতা, পরমাত্মীয় ভ্রাতা, প্রণয়িনী স্ত্রী, নয়নানন্দকর সন্তান সন্ততি, যাঁহাদিগকে লইয়া বিষময় সংসার অমৃতময় হয়, সংসারের দুঃখ যন্ত্রণায় দগ্ধ হইয়া যাঁহাদের সহবাসে নবজীবন পাওয়া যায়-সেই অমৃতের প্রতিমাগুলি যেরূপ ভাবে বিসর্জ্জন দেওয়া হয়, তাহা মনে হইলেও হৃদয় শতধা বিদীর্ণ হইয়া থাকে। স্নেহের পুত্তলী বলিয়া যে মুখে পিতা মাতা কতবার চুম্বন করিয়াছেন, হৃদয়ধন বলিয়া যাহাকে হৃদয়েই রাখিতেন—সেই স্নেহের পুত্তলী যে কোন প্রাণ ধরিয়া এমন জনক জননীর মুখে অগ্নি প্রদান করেন বলা যায় না। কেবল মুখাগ্নি কেন? আরও কতরূপ ভয়ানক ব্যাপার সম্পাদিত হইয়া থাকে তাহা বর্ণনাতীত—যাহাকে কখন গৃহের বাহির করা হয় নাই, যাহার সুখস্বচ্ছন্দতার জন্য এক দিন কত চিন্তা, কত ভাবনা গিয়াছে, তাহারই মৃত দেহ অবাধে সর্ব্বসমক্ষে, দুই হাত প্রমাণ বস্ত্র পরাইয়া অতি অশ্রদ্ধার সহিত ভূতলে নিক্ষেপ করিতে ও

চিতায় ফেলিয়া অগ্নি প্রদান পূর্ব্বক লগুড়দ্বারা মস্তক বিদীর্ণ করিতে কি হৃদয়ে কিছুমাত্র ব্যথা লাগে না? আশ্চর্য্য!!! রামমোহন এই সকল দেখিয়া মর্ম্মে আঘাত পান। যখন কৃষ্ণনগর হইতে শ্রীমতী দেবীর সঙ্কটাপন্ন পীড়ার সংবাদ আসিল, রামমোহন তৎক্ষণাৎ জ্যেষ্ঠ পুত্র রাধাপ্রসাদকে কৃষ্ণনগর পাঠাইয়া দেন এবং গমনকালীন এই বলিয়া দেন যে "যদি তোমার মাতার বাঁচিবার সম্ভাবনা না থাকে, তবে কখনই পাষাণে হৃদয় বাঁধিয়া স্নেহময়ী জননীর মুখাগ্নি করিও না।" রাধাপ্রসাদ পিত্রাদেশ শিরোধার্য্য করিয়া যথাসময়ে কৃষ্ণনগর হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। ইহারই অল্পকাল পরে শ্রীমতী দেবীর মৃত্যু-সংবাদ লইয়া লোক আসিল। রামমোহন স্ত্রী-বিয়োগে শোকান্বিত হইয়াছিলেন সন্দেহ নাই—কিন্তু ব্রহ্মানন্দ-রসে রসজ্ঞ ব্যক্তির সে দুঃখ ক্ষণস্থায়ী মাত্র। তিনি অভয়-দাতার অভয়-নাম হৃদয়ে ধারণ করিয়া গীতারম্ভ করিলেন।——

"মনে কর শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর,
অন্যে বাক্য কবে কিন্তু তুমি রবে নিরুত্তর।"ইঃ—

শ্রীমতী দেবীর মৃত্যুর পর রামমোহন কৃষ্ণনগর গমন করিয়া তদীয় চিতার উপর একটি স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়া দেন, অদ্যাপিও উহার ভগ্নাংশের কতক কতক দেখিতে পাওয়া যায়।

রামমোহনের জ্যেষ্ঠপুত্রের একটি পুত্র ভূমিষ্ঠ হইবার এক মাস পরেই মৃত্যুগ্রাসে পতিত হয়। ঐ মৃতদেহ তিনি একটি বাক্সে রাখিয়া আপন উদ্যান মধ্যে প্রোথিত করেন। তৎপর

বিষয় তিনি এ দেশের দাহসম্বন্ধে আর বিশেষ কোনরূপ উপায় উদ্ভাবন করিয়া যাইতে পারেন নাই।

রামমোহনের ক্রিয়াকলাপের উপর অনেকেরই দ্বেষচক্ষু পতিত হয়, একারণ তাঁহাকে দমন লালসায় নানা স্থান হইতে কি হিন্দু, কি খৃষ্টান, কি মুসলমান সকল সম্প্রদায়ভুক্ত পণ্ডিতমণ্ডলীর সমাগম হইত। গূঢ় অগ্নি কাষ্ঠের ভিতর হইতে যেমন বাহির হয়, সেইরূপ রামমোহন তাহাদের শাস্ত্র বজায় রাখিয়া তাহার গূঢ় প্রদেশ হইতে পবিত্র ধর্ম্মের জ্যোতিঃ বাহির করিয়া দিয়া তাহাদিগকে আশ্চর্য্যান্বিত করিয়াছিলেন।

রামমোহন ধর্ম্মের জন্য আত্মত্যাগ করিতেও অপ্রস্তুত ছিলেন না। এই ভয় তাঁহার সর্ব্বদাই ছিল, পাছে হৃদয়-সর্ব্বস্ব ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্প্রদায়-বিশেষে পরিণত হয়; পাছে ব্রাহ্মধর্ম্ম স্বেচ্ছাচার বা একটা আমোদের দ্রব্য হইয়া উঠে। এই কারণে তিনি বেদবিধি অবলম্বন করেন। রামমোহনের কার্য্যের মধ্যে একটি অদ্ভুত গুণ ছিল—তাঁহাকে সকল সম্প্রদায়ীরাই আপনাপন সম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়া মনে করিতেন। তাহার কারণ এই যে, রামমোহন কাহাকেও শত্রু বলিয়া জ্ঞান করিতেন না। যদি তাহাই করিতেন তবে তিনি কখনই ডাক্তার ডফের বিদ্যালয় স্থাপনা সম্বন্ধে এতাধিক্ সাহায্য করিতেন না। উক্ত বিদ্যালয়ে বাইবেল পাঠ্য পুস্তক মধ্যে পরিগণিত হইলেও উদারচরিত রামমোহন ব্রাহ্মসভাগৃহে প্রথমতঃ ডফের বিদ্যালয় সংস্থাপনের অনুমতি দিয়াছিলেন।কোন ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রতি তাঁহার অণুমাত্র অবজ্ঞা ছিল না। তবে খৃষ্টীয় সমাজ তাঁহাকে যে ভাবে অঙ্কিত করেন, অন্যান্য সম্প্রদায়ীরা ততদূর করিতে সাহস

করেন না। তাঁহারা তাঁহাকে খৃষ্টান বলিতেছেন। কিন্তু তিনি যে কিরূপে খৃষ্টান হইলেন তাহার সামান্যরূপ প্রমাণ কোথায়ও পাওয়া যায় না। তাঁহার ইয়োরোপ যাত্রার পূর্ব্বে তিনি তাঁহার শিষ্যগণের নিকট স্পষ্টই বলিয়াছিলেন যে তাঁহার মৃত্যুর পর কি হিন্দু কি মুসলমান কি খৃষ্টান পরস্পর তাঁহাকে আপনাপন সম্প্রদায় ভুক্ত বলিয়া মনে করিবেন কিন্তু তিনি কোন সম্প্রদায় ভুক্তই নন। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস-একমাত্র পরব্রহ্মই উপাস্য দেবতা এবং সেই মহান ভূমার জ্ঞানলাভই সকল শিক্ষার শ্রেষ্ঠ শিক্ষা। তথাপি তাঁহাকে খৃষ্টান বলিতে হইবে—এবড় আশ্চর্য্যের কথা! ব্রাহ্মণ পুত্র রীতিমত যজ্ঞোপবীত ধারণ না করিলে যেমন ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত হয় না, সেইরূপ খৃষ্টানদের মধ্যে ব্যাপ্‌টাইজের রীতি প্রচলিত আছে—কেবল রীতি কেন? উহা না হইলে আবার মুক্তি নাই। কই রাম-মোহন ত কোথাও ব্যাপ্‌টাইজ হন নাই। যদি খৃষ্টধর্ম্ম তিনি এতই সার ধর্ম্ম বলিয়া জানিয়াছিলেন তবে অবশ্যই কোথাও না কোথাও ব্যাপ্‌টাইজ হইতেন। কিন্তু ব্রহ্মানন্দ রামমোহন সে পথ হইতে বহু দূরে ছিলেন। মৃত্যু শয্যায়ও তাঁহার উপবীত দেখা গিয়াছিল। এ অবস্থায় তাঁহাকে খৃষ্টান বলিতে যাওয়া ধৃষ্টতা মাত্র। স্বীকার করি, তিনি খৃষ্টের উপদেশ গুলিকে হৃদয়ের সহিত শ্রদ্ধা করিতেন। তাই বলিয়া যদি তাঁহাকে খৃষ্টান বলা হয় তবে "তথাস্তু" বলিয়া এই স্থলে নিরস্ত হওয়া গেল।*

---

* "জগন্নাথের মূর্ত্তি প্রকাশ" পুস্তক প্রণেতা জনৈক খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী। তিনি জগন্নাথের মূর্ত্তিকেও খৃষ্টের "ক্রুশের" প্রতিরূপ বলিতেছেন। তাঁহার মতে উহা কোন হিন্দুর দেবমূর্ত্তি নহে।

তিনি সকল ধর্ম্মশাস্ত্রেরই মূল অন্বেষণ করিবার নিমিত্তই গ্রীক, লাটিন, আরবী প্রভৃতি ভাষা শিক্ষায় প্রবৃত্ত হন। তিনি কোরাণ, বাইবেলের আদি গ্রন্থ হইতে মূল সত্য বাহির করিয়া এক পরব্রহ্মের সত্যতা প্রতিপন্ন করেন। ইহা কেনা স্বীকার করিবেন যে, কেবল আপনার বলিয়া নয়, সকল শাস্ত্রকেই রামমোহন সমচক্ষে দর্শন করিতেন। বেদ, বাইবেল, কোরাণ প্রভৃতির অতিরঞ্জিত আড়ম্বরভাগ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সত্যের ভাগ নিখাত করিয়া তিনি কেবল ভারতের কেন, সমস্ত জগতের পরম উপকার সাধন করিয়া গিয়াছেন। তৎকৃত "Precepts of Jesus the guide to peace and happiness" * এবং আরব্যভাষায় "তোহপতুলমাআহিদিন" ইত্যাদি পুস্তক ইহার প্রকৃত প্রমাণস্থল।

রামমোহনের আর একটি অসাধারণ গুণ ছিল। তিনি বিশেষ সঙ্গতিপন্ন লোক ছিলেন বটে, ঈশ্বর-কৃপায় তাঁহার কোন বিষয়ে কিছুমাত্র অভাব ছিল না। কিন্তু ভ্রমেও কখন তিনি আপন সম্পত্তির গৌরবে মুগ্ধ হইতেন না। রাজপ্রাসাদ পর্ণকুটীর তিনি সমজ্ঞান করিতেন। তাঁহার নিকট দরিদ্র বা ধনীর বিভিন্নতা ছিল না। একদা বর্দ্ধমানের রাজা তেজচন্দ্র বাহাদুর তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন। এই সময় তাঁহার আর একটি বন্ধুও উপস্থিত হন। বলা বাহুল্য যে রামমোহন উভয়কেই সমান আদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার এই সকল বিনয়ী অমায়িক স্বভাবেই তাঁহাকে সেই ভয়ানক সময়েও

* ১৮২০ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

সকলের নিকট যশস্বী করিয়া তুলিয়াছিল। রামমোহন বিশেষ জানিতেন যে, ধনগৌরবে মোহিত হওয়া নীচমনার কায্ ও ধর্ম্মসংস্কারকগণের পক্ষে উহা সর্ব্বনাশের মূল। সুতরাং এই সকল নীচ প্রবৃত্তি হইতে উচ্চমনা রামমোহন বহুদূরে অবস্থান করিতেন।

কোন সময়ে তিনি লিভরপুলের নিকট একটী কারখানা দেখিতে যান। তাঁহার আগমন বার্ত্তা পাইয়া স্থানীয় কারিকরগণও তাঁহাকে দেখিবার জন্য দলেদলে আসিতে লাগিল। ইহারা যদিও সামান্য শ্রেণীর লোক তথাপি তিনি পরম পরিতোষ সহকারে তাহাদের সকলের সহিত করমর্দ্দন করিয়াছিলেন। কোন বিঘ্নই তাঁহাকে বাধা দিতে সমর্থ হয় নাই। অপরিষ্কার কালী মাখা ছিন্ন বস্ত্রের প্রতি তিনি লক্ষ্যও করিলেন না। প্রত্যূষভ্রমণ তাঁহার অত্যন্ত অভ্যাস ছিল। কলিকাতা-বাস কালীন একদিন তিনি এই রূপ বেড়াইতে বাহির হইয়াছেন এমন সময় দেখিতে পাইলেন একটি মুটে মোট নামাইয়া দাঁড়াইয়া আছে। একাকী কোনরূপেই মোটটী মাথায় তুলিতে পারিতেছে না। যাহাকে সম্মুখে দেখিতেছে তাহাকেই সাহায্য প্রার্থনায় কাকুতি মিনতি করিতেছে কিন্তু কেহই তাহার কথায় কর্ণপাত করিতেছে না। এই দেখিয়া তিনি আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না, তখন স্বয়ং গিয়া মোটটী তাহার মাথায় তুলিয়া দিলেন। অধুনাতন কয়টী লোককে এরূপ কার্য্য করিতে দেখা যায়? অর্থের তারতম্যের সহিত তাঁহার শ্রদ্ধা ভক্তির অণুমাত্র তারতম্য ছিল না। এই সকল অসামান্য গুণেই তিনি সকলের হৃদয় জয় করিয়া ছিলেন।

রামমোহনের বিলাত গমন বাসনা এই সময় হইতে প্রবল হইয়া উঠে। তখন প্রায়ই তিনি "সারকিউলার" রোডস্থ তাঁহার বৃক্ষ-বাটিকাতে নির্জ্জনে থাকিয়া বিদ্যানুশীলনে দিনপাত করিতেন। একদা তথায় কথাপ্রসঙ্গে তিনি তাঁহার কোন বয়স্যকে বলিয়া ছিলেন "আমার ইচ্ছা সর্ব্বত্যাগী হইয়া কোন নির্জ্জন গিরিগুহাপ্রান্তরে থাকিয়া বেদান্ত ও মেস্‌নাভি * পাঠে দিন যাপন করি" † উদ্যানে একটি দোল্‌না তাহার বসিবার আসন ছিল। তদ্দর্শনে তাঁহার জনৈক শিষ্য তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন যে "উপবেশনের এত সরঞ্জাম থাকিতেও কি সামান্য একটা দোল্‌না আপনার এত প্রিয় হইল?" রামমোহন ঈষদ্ধাস্য পূর্ব্বক উত্তর করিলেন "ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ছেলেকে বিলাত যাইতে হইলে অনেক রকম শিক্ষা করিতে হয়। ছয় মাস কাল যে জাহাজে যাইতে হইবে এখন হইতেই তাহা অভ্যাস করা যাইতেছে।" এস্থলে কতক-গুলি রহস্যের অভিনয় হয় তাহার কয়েকটী নিম্নে দেওয়া গেল।

একদা এক ব্রাহ্মণ কোন বিষম রোগাক্রান্ত হইয়া কোন এক

---

* কোন বিখ্যাত পারস্য কবি প্রণীত রাজনীতি ও ধর্ম্মনীতি সম্বন্ধীয় গ্রন্থ।

†এস্থলে প্রসিদ্ধ দার্শনিক বেন্থামের বিষয়ে একটি কথা বলিলে বোধ হয় অসঙ্গত না হইতে পারে। মহাত্মাগণের জীবনচরিত পাঠে জানা যায় ক্রমে তাঁহারা যেমন প্রকৃতিতত্ত্ব পর্য্যালোচনায় প্রগাঢ় রূপ নিবিষ্ট হইয়া পড়েন অমনি সংসারের প্রতি তাঁহাদের কেমন এক বিরাগ জন্মিয়া যায়। রামমোহন রায়ের পরমবন্ধু জামিরে বেন্থাম সংসারের কোলাহলে জ্বালাতন হইয়া নির্জ্জন ব্রত অবলম্বন করেন। রামমোহন যে রাত্রে লণ্ডন নগরে উপনীত হন সেই গভীর নিশিতে তিনি রাজার সহিত সাক্ষাৎ লালসায় কেবল স্বীয় আশ্রম পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

দেবীর নিকট ধরণা দেন। তাঁহাকে স্বপ্নে এই আদেশ হয় যে, যদি সে তাহার স্বগ্রাম নিবাসী জনৈক নির্দ্দিষ্ট বৃদ্ধ তেলীর উচ্ছিষ্ট অন্ন ভক্ষণ করিতে পারে তবে এ বিষম রোগের গ্রাস হইতে রক্ষা পাইবে। ব্রাহ্মণ মহা বিপদে পড়িলেন—কিরূপে যজ্ঞোপবীতধারী হইয়া নীচ জাতির অন্ন ভক্ষণ করেন আর হিন্দু সমাজেই বা তাহার কি দশা করে? ব্রাহ্মণ ইতস্ততঃ করিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। অনেক বড় বড় মহা নগরের অধ্যাপকের ব্যবস্থা চাহিলেন কেহই তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধির কোন উপায় নির্দ্দেশ করিতে পারিলেন না। ব্রাহ্মণ ইতিকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া রামমোহনের নিকট গমন করেন ও আপন বৃত্তান্ত সবিশেষ বিবৃত করেন। রামমোহন সমস্ত অবগত হইয়া ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, "ঐ বৃদ্ধ তেলী কি আপনার বিশেষ অনুগত?" ব্রাহ্মণ তদুত্তরে বলেন যে সে পুরুষানুক্রমে তাহাদের প্রজা ও অতীব অনুগত। রামমোহন পুনরায় প্রশ্ন করেন যে, ব্রাহ্মণ সঙ্গতিপন্ন লোক কি না? ব্রাহ্মণ তাহাও স্বীকার করেন। তখন রামমোহন বলিলেন "বৃদ্ধ তেলীর উচ্ছিষ্ট ভক্ষণের উপায় এখানে নাই, অবিলম্বে জগন্নাথক্ষেত্রে গিয়া অবাধে তিনি আপন অভিলাষ পূর্ণ করিতে পারেন। রামমোহন এরূপ ভাবুক ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বয় পূর্ণ ছিলেন যে সকল কার্য্যই তিনি আপন নখাগ্রে দেখিতেন।

টাকীর প্রসিদ্ধ কালীনাথ মুন্সি রামমোহনকে অত্যন্ত ভক্তি করিতেন ও তাঁহাকে অনেক বিষয়ে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিতেন। একদা কোন ব্যক্তি কালীনাথ বাবুর নিকট একটি শঙ্খ বিক্রয়ার্থ আসে। এই শঙ্খের ভয়ানক গুণ—উহা যাহার নিকট থাকে

তাহার আর কিছুরই অভাব থাকে না—কমলা অচলা হইয়া সেই গৃহে অবস্থান করেন। শঙ্খের এবম্বিধ আশ্চর্য্যগুণ শুনিয়া মুন্সি মহাশয় উহা গ্রহণে কৃতসঙ্কল্প হন। ঐ শঙ্খের পাঁচশত টাকা মূল্যও ধার্য্য হইল। কালীনাথ শঙ্খ বিক্রেতাকে রামমোহনের নিকট লইয়া গেলেন এবং পরম আহ্লাদ সহকারে শঙ্খের অদ্ভুত গুণ ও মূল্যের বিষয় সকল শুনাইলেন এবং এবিষয়ে তাঁহার মতামত জিজ্ঞাসা করিলেন। রামমোহন আনুপূর্ব্বিক সমস্ত অবগত হইয়া উত্তর করিলেন যে "সমস্ত জগৎ যাঁহার জন্য হাহাকার করিতেছে, যিনি আবাল বৃদ্ধ বনিতার অভীষ্টদেবী—সেই কমলাকে যদি পাঁচ শত টাকার বিনিময়ে দৃঢ়বন্ধনে গৃহে রাখা যায় তবে ইহা অপেক্ষা আর কি আছে? কিন্তু জিজ্ঞাসা করি কেবল মাত্র পাঁচ শত টাকা পাইয়াই কেন শঙ্খ বিক্রেতা আপন চিরলক্ষ্মী দিতেছে? তবে কি পাঁচ শত টাকাই অচলা কমলা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইল। তখন স্বয়ং মুন্সির ও তাঁহার পারিষদবর্গের নিদ্রা ভঙ্গ হইল এবং আর বাক্যব্যয় না করিয়া তৎক্ষণাৎ অচলা কমলা বিক্রেতাকে বিদায় করিয়া দিলেন।

দ্বারকানাথ ঠাকুরের পরিচিত জনৈক মহা পৌত্তলিক ব্রাহ্মণ তাঁহার পূজার ফুলের অভাব হওয়ায় তাঁহাকে জানান। দ্বারকানাথ বাবু তাঁহাকে রামমোহন রায়ের পুষ্পোদ্যানে যাইতে বলেন। ব্রাহ্মণ তখন কুপিত হইয়া বলিলেন যে "সে মহাপাতকী, তাহার নামে পাতক—এমন চণ্ডালের উদ্যানে আমায় যাইতে বলেন?" পরে দ্বারকানাথ তাহাকে বিশেষ বুঝাইয়া রামমোহনের কথিত উদ্যানে পাঠাইয়া দেন। এই স্থানে অনে-

কেই আসিয়া ফুল লইয়া যাইত, কেবল নির্দ্দিষ্ট এক স্থানের ফুল তুলিবার নিষেধ ছিল; ব্রাহ্মণ সেই স্থানেরই পুষ্প চয়নে প্রবৃত্ত হন। সেখানে রক্ষকগণ তাঁহাকে নিবারণ করিলে পর তিনি ক্রোধান্ধ হইয়া বলেন যে, " আমার ন্যায় লোক যে এই পাতকীটার উদ্যানে পদার্পণ করিয়াছে ইহাই ধন্য বলিয়া না মানিয়া আবার নিবারণ করিতেছিস্ ?" অদূরে থাকিয়া রামমোহন সকল শুনিতে ছিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ ব্রাহ্মণের নিকট গিয়া বলিলেন "কেন ঠাকুর এত উষ্ণ হইয়াছেন ? আর বলুন দেখি আমি কিসে ধর্ম্মভ্রষ্ট হইলাম ?" ব্রাহ্মণ সংস্কৃত বিদ্যাবিশারদ ও অপর পক্ষ রামমোহন—উভয়ের মধ্যে তখন ঘোর তর্ক আরম্ভ হইল-উভয়েই অনাহারী থাকিয়া বিষম তর্কে সমস্ত দিবস কাটাইলেন; পরিশেষে ব্রাহ্মণ ফুলের সাজি দূরে নিক্ষেপ করিয়া গুরু সম্বোধনে রামমোহনের পদে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন। তখন তিনি সশঙ্কিত হইয়া মহাসমাদরে ব্রাহ্মণের হস্তধারণ পূর্ব্বক একত্রে ভোজন করিতে গেলেন। অনেকে বলেন ইনিই প্রসিদ্ধ ব্রহ্মানন্দ রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ। * ইনিই মৃত্যুকালে ব্রাহ্ম সমাজে পাঁচ শত টাকা দান করিয়া যান।

একটি ব্রাহ্মণ প্রত্যহ প্রাতঃকালে তদীয় সেই উদ্যান-শালায় আসিয়া পূজার্থ পুষ্প লইয়া যাইতেন। একদা ব্রাহ্মণ একটি বৃক্ষের উপর আপন গাত্রবস্ত্র রাখিয়া অপর এক বৃক্ষে আরোহণ পূর্ব্বক পুষ্প চয়ন করিতেছেন, ইত্যবসরে রামমোহনের সঙ্কেতানুযায়ী তদীয় জনৈক ভৃত্য ব্রাহ্মণের অজ্ঞাতসারে তাহার

---

* রামমোহন রায় কৃত "ভট্টাচার্য্যের সহিত বিচারের চূর্ণক' নামক পুস্তক এই বিচারের সারভাগ।

গাত্রবস্ত্র লইয়া গেল। ব্রাহ্মণ পুষ্প লইয়া অভিলষিত স্থানে আসিয়া দেখেন বৃক্ষোপরি গাত্রবস্ত্র নাই। ব্রাহ্মণ ক্রন্দন আরম্ভ করিলেন। ইত্যবসরে রামমোহন তথায় আসিয়া উপনীত হইলেন। ব্রাহ্মণ তাঁহাকে দেখিয়া ক্রুদ্ধস্বরে বলিতে লাগিলেন, "শুনিয়াছি ব্রহ্মজ্ঞানীরা দেবজানিত লোক কিন্তু কি পরিতাপের বিষয় সেই একজন প্রধান ব্রহ্মজ্ঞানীর উদ্যানে আসিয়া আমার একমাত্র শীত-বস্ত্রটা হারাইলাম। রামমোহন ব্রাহ্মণকে সান্ত্বনা করিয়া তৎক্ষণাৎ গাত্রবস্ত্র আনাইয়া দিলেন এবং বলিলেন " ভৃত্য ভাল মনেই আপনার বস্ত্রখান লইয়া সাবধানে রাখিয়াছিল, যাহাহউক এখন সন্তুষ্ট হইলেন ত ?" ব্রাহ্মণ তখন মনে ভাবিলেন রামমোহন বুঝি তাঁহাকে দান করিলেন ; এই ভাবিয়া কর্কশস্বরে কহিলেন "আপনার ধন ফিরিয়া পাইলাম তাহাতে আবার তুষ্ট কি ?" রামমোহন বলিলেন "এ পুষ্পগুলি কাহার, এবং এগুলি লইয়াই বা কি করিবেন ?" ব্রাহ্মণ পূর্ব্বমত তীব্রস্বরে কহিলেন "কেন দেবতার পুষ্প, দেবতারই তুষ্ট্যর্থে সমর্পণ করিব।" বাক্‌পটু রামমোহন ঈষদ্ধাস্য পূর্ব্বক পুনরপি কহিলেন "তবে ঠাকুর ! যাঁহার ধন তাঁহাকে দিলে কি তিনি খুসী হন ?" এই ব্রাহ্মণও কালে আর্য্য ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া প্রধান ধর্ম্ম-সংস্কারকের নিকট ধর্ম্ম শিক্ষা করেন। রামমোহন এই উপায়ে অনেক লোককে পবিত্র ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন, তিনি বিদ্যোৎসুককে বিদ্যাদান করিয়া বিষয়ীর বিষয় বৃদ্ধি করিয়া দিয়া, দরিদ্রের অন্নের উপায় করিয়া এবং ধর্ম্মানুসন্ধিৎসুকে জ্ঞানযোগ দিয়া পবিত্র পথে আনয়ন করিয়াছিলেন।

বাবু অক্ষয় চন্দ্র সরকার কর্ত্তৃক সম্পাদিত "নবজীবন"

নামক মাসিক পত্রে দিগম্বর ভট্টাচার্য্য শীর্ষক একটি প্রবন্ধ বাহির হয়,তাহার একস্থলে লিখিত আছে।"দিগম্বর ভট্টাচার্য্যের সহিত রাজা রামমোহন রায়ের বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। ভট্টাচার্য্যের নিবাস এই কলিকাতাতেই হইবে। যখন রামমোহন রায় কলিকাতায় বাস করিতেন, তখনই ভট্টাচার্য্য সর্ব্বদাই তাঁহার নিকট থাকিতেন; এরূপ প্রবাদ, যে উভয়ে একত্র সুরাপান করিতেন। যাহাই হৌক, দিগম্বরে রামমোহনে বিশেষ সখ্যভাব ছিল, উভয়ে মধ্যে মধ্যে বিচার বিতর্ক হইত।"

"দিগম্বর ভট্টাচার্য্য" নামে তাঁহার কোন মিত্র ছিলেন কি না তাহা আমরা বিশেষ অনুসন্ধানেও জানিতে পারিলাম না, তবে তাঁহার নিকট একজন ভট্টাচার্য্য এই উদ্যান বাটীতেই থাকিতেন, হইতে পারে তাঁহার নাম "দিগম্বর ভট্টাচার্য্য।" যাহা হউক দিগম্বর ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক রাজার গীতের প্রত্যুত্তর "নবজীবন" হইতে এই স্থলে উদ্ধৃত হইল। ভরসা করি পাঠকবর্গের ঐগুলি প্রীতিপ্রদ হইতে পারে।

রামমোহন রায়ের গান।

১

বসন্ত বাহার—আড়াঠেকা।

মন তুমি সদা কর তাঁহার সাধনা।
নির্গুণ গুণাশ্রয় রহিত কল্পনা॥
যে ব্যাপিল সর্ব্বত্র, তবু মন বুদ্ধিনেত্র
নাহি পায় কি বিচিত্র, কেমন জান না

জানিতে তায় পরিশ্রম,
করিছ সে বৃথা শ্রম,
সে সব বুদ্ধির ভ্রম, দুঃসাধ্য সূচনা
বিচিত্র বিশ্ব নির্ম্মাণ,
কার্য্য দেখে কর্ত্তা মান
আছে মাত্র এই জ্ঞান অতীত ভাবনা।

সিন্ধু ভৈরবী—আড়া ঠেকা।

তুমি কার কে তোমার
কারে বল রে আপন।
মহামায়া নিদ্রাবশে দেখিছ স্বপন।
রজ্জুতে হয় যেমন ভ্রমে অহি দরশন,
প্রপঞ্চ জগৎ মিথ্যা, সত্য নিরঞ্জন।
নানাপক্ষী এক বৃক্ষে,
নিশিতে বিহরে সুখে,
প্রভাত হইলে সবে যায় নানাস্থান
তেমতি জানিবে সব অমাত্য বন্ধু বান্ধব
সময়ে পলাবে তারা, কে করে বারণ।
কোথা কুসুম চন্দন, মণিময় আভরণ
কোথা বা রহিবে তব, প্রাণ-প্রিয়জন।
ধন যৌবন মান, কোথা রবে অভিমান,
যখন করিবে গ্রাস নিষ্ঠুর শমন।

উত্তরে ভট্টাচার্য্যের গান।

১

বসন্ত বাহার, আড়াঠেকা।

কেন ক্ষেপা কর তবে তাঁহার সাধনা?
নির্গুণ যদি তিনি রহিত কল্পনা

*　　*　　*
*　　*　　*
*　　*　　*

"আছে মাত্র" এই জ্ঞান
তবে কেন গাও গান
চক্ষু মুদি কার ধ্যান,
কিসের ভাবনা?

সিন্ধু ভৈরবী—আড়া ঠেকা।

মা আমার, আমি তাঁর,
তাঁরে বলি রে আপন।
মহামায়া মায়ে আমি দেখি রে স্বপন।
রজ্জুতে হয় যখন, ভ্রমে অহি দরশন,
অহি মিথ্যা রজ্জু মিথ্যা বল কি তখন?
নিশিতে বিহরিসুখে, যায় পাখী দিকে দিকে
আবার ফিরিয়া আসে, আমারি মতন।
যাতায়াতে সমাচার, নিত্যসত্য এ সংসার
চিন্ময়ী-চরণচিন্তা সংসার বন্ধন।

রামমোহন রায়ের গান।

বেহাগ—আড়া ঠেকা।

মন একি ভ্রান্তি তোমার।
আবাহন বিসর্জ্জন কর তুমি কার।
যে বিভু সর্ব্বত্র থাকে, ইহাগচ্ছ বল তাকে
তুমি কে বা আন কাকে, একি চমৎকার
অনন্ত জগতাধারে, আসন প্রদান ক'রে
ইহ তিষ্ঠ বল তাঁরে, একি অবিচার,
একি দেখি অসম্ভব, বিবিধ নৈবেদ্য সব
তাঁরে দিয়া কর স্তব, এবিশ্ব যাঁহার।

সিন্ধু ভৈরবী, আড়াঠেকা।

লোকে জিজ্ঞাসিলে বল,
আছি ভাল প্রাণে প্রাণে,
কোথায় কুশল তব,
আয়ুর্যাতি দিনে দিনে।
দারা সুত প্রভৃতি,
কেহ না হইবে সাথী,
জ্ঞান করি অবস্থিতি,
তোমার সহায় জীবনে,
যুক্তিবেদ মতে চল,
মিথ্যা মায়ায় কেন ভুল,
ইন্দ্রিয় আছে সকল,
ভজ সত্য নিরঞ্জনে।

কেদারা—আড়া ঠেকা।

অহঙ্কারে মত্ত সদা অপার বাসনা।
অনিত্য যে দেহ মন জেনে কি জান না
শীত গ্রীষ্ম আদি সবে,
বার তিথি মাস রবে,
কিন্তু তুমি কোথা যাবে,
একবার ভাবিলে না।
অতএব বলি শুন, ত্যজ রজঃ তমগুণ,
ভাবিলেই নিরঞ্জন এবিপত্তি রবে না।

উত্তরে ভট্টাচার্য্যের গান।

বেহাগ—আড়া ঠেকা।

ভ্রান্তিতে শান্তি—আমার।
আবাহন বিসর্জ্জনে ক্ষতি কি বা কার!
সর্ব্বত্র পূরিত বায়, গ্রীষ্মে যবে প্রাণ যায়,
বলি বায়ু আয় আয় জীবন সঞ্চার।
জগমাতা জগময়ী, যখন কাতর হই,
বলি এসো ব্রহ্মময়ী, করগো নিস্তার।
জড় জীব জড় করি, যাহার সাধন করি
ধ্যানজ্ঞান জল ফল সকলিত তাঁর।

সিন্ধু ভৈরবী, আড়াঠেকা।

লোকে জিজ্ঞাসিলে বলি,
ভাল আছি খোলা প্রাণে।

ভাল মায়ের বেটা আমি,
ভাল না থাকিব কেনে ?
দারা সুত প্রভৃতি
সকলে সাধনা সাথী
চক্র করি অবস্থিতি
মত্ত থাকি সুধাপানে
তন্ত্রে মন্ত্রে ভর করি,
ভাবি সেই দিগম্বরী,
ইন্দ্রিয় গেল বা র'ল
কখন ত ভাবিনে ।

কেদার আড়া ঠেকা ।

ওঁকারে মত্ত মন অপার বাসনা ।
দেহ সত্য মন সত্য,
সত্য শ্যামা-সাধনা
শীত গ্রীষ্ম আদি ছয়, আসে যায় রয়, হয়,
পুত্রের সাধনা রয়, মায়ের করুণা,
অতএব শুন বলি,
ত্যজ মিথ্যা মিথ্যা বুলি ।
সত্যময়ী তথ্য লও, যাবে ভাবনা ॥

রামমোহন রায়ের গান ।

ইমণ কল্যাণ—আড়াঠেকা ।

একি ভুল মন । (তোমার)

দেখিবারে চাহ যাঁরে
না দেখে নয়ন।
আকাশ বিশ্বেরে ঘেরে,
যে ব্যাপিল আকাশেরে,
আকাশের ন্যায় তাঁরে
মানা এ কেমন
চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ যত,
যে চালায় অবিরত,
তাঁরে দেখাইতে কত করহ যতন।
পশু পক্ষী জলচরে, যে আহার দেয় নরে,
চাহ সেই পরাৎপরে
করাতে ভোজন।

ললিত—আড়াঠেকা।

কোথা হতে এলে কোথা
যাইবে কোথা রে।
নিদ্রাবশে দেখ যেমন বিবিধ স্বপন
প্রপঞ্চ জগতে তেমন
ভ্রমে সত্য দরশন।
অতএব দেখ বুঝে যিনি সত্য ভজ তাঁরে।

বেহাগ—একতালা।

মন তোরে কে ভুলালে হায়!
কল্পনারে সত্য করি জান একি দায়।।

প্রাণ দান দেহ যাঁকে,
যে তোমার বশে থাকে,
জগতের প্রাণ তাকে, কর অভিপ্রায়
কখন ভূষণ দেহ, কখন আহার,
ক্ষণেক স্থাপহ ক্ষণে করহ সংহার,
প্রভু বলি মান যাঁরে,
সম্মুখে নাচাও তাঁরে,
এত ভুল এ সংসারে
কে দেখে কোথায়।

উত্তরে ভট্টাচার্য্যের গান।

প্রসাদী সুর—একতালা।

ভুল নয়, ভুল নয়, ঐ দেখ ওই!
আঁধারে করিছে আলো ঐ যে আমার—
[ব্রহ্মময়ী
পদতলে পড়ি মহেশ বিকলে,
লক্ষ লক্ষ কর কটির শিকলে,
চন্দ্র সূর্য্য বহ্নি নয়ন নিকলে
বদনে মা ভৈঃ মা ভৈঃ।
অট্ট অট্ট হাস, বিকট বিকাশ,
ত্রাসিত আকাশ, সমরে জয়ী।
করাল বদনে সরল হাসিছে,
মরাল গমনে মেদিনী কাঁপিছে

তালে তালে তালে সুঠাম
নাচিছে তাথৈ তাথৈ।

ললিত--আড়াঠেকা।

কোথা হতে এলাম আমি
যাইব কোথায় রে।
মা আমার, আমি মার,
ভাবনা কি তায় রে।
ভক্তিভরে দেখিতেছি জাগ্রতে খেয়াল
আমার মায়ের আমি স্নেহের ছাওয়াল
তাঁহার কোলেতে শুয়ে
ধরিয়াছি রাঙ্গা পায় রে।

ভৈরবী—মধ্যমান।

ভুবন ভুলালে মায়ায় ভুবনমোহিনী।
কল্পনারে সত্য করি দেখা দিলা জননী
কল্পনায় অধিষ্ঠান; কল্পনায় দেই প্রাণ,
সত্য করি আত্মদান, এই মাত্র জানি।
কখন ভূষণ দেই কখন অশন,
কখন স্থাপন করি, কভু বিসর্জ্জন,
মাতৃরূপা দেখি চক্ষে,
নাচিছে বাপের বক্ষে
ভয়ে বলি সর্ব্বরক্ষে
কর সর্ব্বরূপিণী।

রামমোহন রায়ের গান।

ইমন ভূপালী—ঢিমা তেতালা।

ভুল না নিষাদ কাল,
পাতিয়াছে কর্ম্ম জাল,
সাবধান রে আমার মানস বিহঙ্গ।
দেখ নানাবিধ ফল, ও যে কর্ম্মতরু ফল,
গরলময় কেবল, দেখিতে সুরঙ্গ।
ক্ষুধায় আকুল যদি হইয়াছ মন,
নিত্যসুখে জ্ঞানারণ্যে করহ গমন।
সুন্দর তরু নির্ভয়, অমৃতাক্ত ফলচয়,
পাইবে ভোগিতে কত আনন্দ বিহঙ্গ।

পূরবী—আড়াঠেকা।

গ্রাস করে কাল পরমায়ু প্রতিক্ষণে
তথাপি বিষয়ে মত্ত
সদা ব্যস্ত উপার্জ্জনে।
গত হয় আয়ু যত স্নেহে কহ হলো এত
বর্ষ গেলে বর্ষ বৃদ্ধি কহে বন্ধুগণে।
এসব কথার ছলে, কিম্বা ধন জন বলে,
তিলেক নিস্তার নাই কালের দর্শনে,
অতএব নিরন্তর চিন্ত সত্য পরাৎপর
বিবেক বৈরাগ্য হলে কি ভয় মরণে,

রামকেলী—আড়া ঠেকা।

মনে কর শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর।
অন্যে বাক্য কবে কিন্তু তুমি রবে নিরুত্তর
যার প্রতি যত মায়া,
কিবা পুত্র কিবা জায়া
তার মুখ চেয়ে তত হইবে কাতর।
গৃহে "হায় হায়" শব্দ
সম্মুখে স্বজন স্তব্ধ,
দৃষ্টিহীন, নাড়ীক্ষীণ হিম কলেবর!
অতএব সাবধান,
ত্যজ দম্ভ অভিমান,
বৈরাগ্য অভ্যাস কর সত্যেতে নির্ভর।

উত্তরে ভট্টাচার্য্যের গান।

ইমন ভূপালী—ঠেকা তেতালা।

দেখরে! বুদ্ধি নিষাদ।
পাতিয়াছ জ্ঞান ফাঁদ,
সাবধান রে আমার মানস বিহঙ্গ।
দেখ নানাবিধ ফল ওযে গরল কেবল,
তর্কে তর্কে চল চল, দেখিতে সুরঙ্গ।
ক্ষুধায় আকুল যদি হইয়াছে মন
কর্ম্ম রথে ভক্তি পথে করহ গমন,
মিলিবে মুক্তির ফল, মধু তাহে অবিরল
মত্ত হবে সুধাপানে দেখিবে যে রঙ্গ।

পূরবী—আড়া ঠেকা।

তিলে তিলে পরমায়ু বাড়িতেছে প্রতিক্ষণে
ধীরে ধীরে ভক্তি নদী ধায় শ্যামা-চরণে।
বৃদ্ধি পায় আয়ু যত, পুত্র হয় মাতৃরত,
কোলে টানে মা যে তত, আপন সন্তানে
পরের কথার ছলে,
পুত্র কি আর টলে, বলে,—
ভয় নাহি আর সেই কালের দর্শনে।
এক চিন্তা নিরন্তর মায়ে পোয়ে এক স্বর
ভেদ নাহি অতঃপর জীবনে মরণে।

পূরবী—আড়া ঠেকা।

মনে কর শেষের সে দিন সুখকর।
আধনীরে গঙ্গাতীরে শঙ্কা হীন নর।
কাটায়ে সংসার মায়া,
আশীর্ব্বাদি পুত্র জায়া,
নিরমাল্য বিল্ব পত্র মাথার উপর।
চিন্ময়ী ধরেছ বুকে,
কালী কালী নাম মুখে,
কালী নাম সবে ডাকে, করি উচ্চস্বর।
কালী নাম অবিচ্ছেদ,
স্বর্গে মর্ত্তে নাহি ভেদ,
ব্রহ্মরন্ধ্র করি ভেদ উঠে দিগম্বর।

রামমোহন যথাসাধ্য জন্মভূমিকে বিবিধ ভূষায় বিভূষিত করিবার জন্য কিছুই অবশিষ্ট রাখেন নাই। তিনি বিলক্ষণ জানিতেন একতাই জাতীয় উন্নতির মহৎ উপায়—ধর্ম্মই একতার ভিত্তিস্বরূপ। সমস্ত ভারত এক সত্যধর্ম্মাবলম্বী হইলে, এক মনে একতানে সুবিস্তীর্ণ ভারতের চারিধার হইতে এক মাত্র পরব্রহ্মের জয়ধ্বনি উত্থিত হইলে, কি জানি চির অভাগিনী ভারত-ভাগ্যে কি ঘটে। রামমোহন ব্রাহ্মগণের মধ্যে "ভ্রাতৃ" শব্দ প্রচলিত করেন। সমাজে সকলেই এক প্রকার বস্ত্র পরিধান করিয়া উপস্থিত হইবেন এটী তাঁহার আন্তরিক ইচ্ছা ছিল। সে সময়ে ব্রাহ্ম মাত্রেই চোগা, চাপকান পায়জামা প্রভৃতি পরিধান করিয়া সমাজে উপনীত হইতেন। অধুনাতন এরূপ কোন প্রথার প্রচলন দেখিলে অনেকে "হায় অনুকরণ সর্ব্বনাশ" এই স্বরে নিশ্চয় গগণমণ্ডল বিদীর্ণ করিয়া দিতেন। কিন্তু তাঁহারা ভ্রমেও একবার বিবেচনা করেন না যে প্রকৃষ্ট সমাজের অনুকরণ না করিলে উন্নতি প্রত্যাশা অল্পই করা যায়। প্রাচীন পণ্ডিতগণ বলেন "মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা।" ইহাতে স্পষ্টই অনুকরণ বিধি প্রতীত হইতেছে। অথবা শাস্ত্র অন্বেষণেরই বা আবশ্যক কি? ক্ষণেককাল জাতীয় বিদ্বেষ ভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক আপনাপন বিশুদ্ধ প্রজ্ঞাকে জিজ্ঞাসা করিলেই অনুকরণের কি মহদভিপ্রায় তাহা সহজেই প্রত্যক্ষীভূত হইবে; সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ভারতের কি অবস্থা ছিল তাহার একটি আনু-মানিক চিত্র প্রদর্শন করিয়া যাহা না হইবে, জাতিবিশেষের মহত্ত্ব প্রত্যক্ষ দৃষ্টি-গোচর করিলে তাহার সহস্রগুণ ফলের সম্ভাবনা! এক পরিধেয় বস্ত্র লইয়া অনুকরণের উপর এরূপ সাংঘাতিক

আঘাত যদি এসময়েও দেখা যায় তবে আর উপায় কি আছে? ভিন্ন-দেশীয় বস্ত্র পরিধানে দেশের মহা অনিষ্ট করা হইল, উন্নতি-পথে কণ্টকার্পিত হইল, ভারতের মলিন মুখ আরও শুখাইয়া গেল, চারিধার ছাই ভস্মে পূর্ণ হইয়া গেল—এইরূপ বিদ্বেষ-পুর্ণ বাক্য প্রকাশে দেশের মঙ্গল না হইয়া কেবল অশুভ ফলই ফলিতেছে। যতদিন বিদ্বেষ, স্বেচ্ছাচার, আত্মগৌরব এদেশে থাকিবে ততদিন চারিধার গরলপূর্ণ থাকিবেই থাকিবে। এ অবস্থায় অমৃতের আশা বিড়ম্বনা মাত্র।

দেশের কি ধর্ম্মসংস্কার কি বিদ্যানুশীলন কি রাজনীতি সকল বিষয়েই রামমোহন রায়ের বিশাল হস্ত দেখিতে পাওয়া যায়। বাঙ্গালা ভাষার নির্ম্মাতা ধরিতে গেলে রামমোহন রায়ই সর্ব্ব প্রথম আমাদের গণনা-পথে সমুদিত হইয়া থাকেন। তৎকৃত গৌড়ীয় ভাষার ব্যাকরণ, ভূগোল, খগোল প্রভৃতি এদেশের পাঠোপযোগী গ্রন্থনিচয় তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। কোন সুবিখ্যাত ব্যক্তি বলিয়াছিলেন "রামমোহন রায়, ডেভিড্ হেয়ার ও ডাক্তার ডফ না থাকিলে এদেশে বিদ্যা-চর্চ্চার এতাধিক উন্নতি হইত কি না সন্দেহ।" তিনি ধর্ম্মসভায় যেমন ধর্ম্মনীতি-বেত্তা, রাজসভায় তেমনি রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন। এস্থলে কেনা স্বীকার করিবেন যে রামমোহন আর্য্যধর্ম্মের মোহিনী শক্তি প্রভাবেই এতদূর উন্নত হইয়া ছিলেন। কালে সকলেই নিভিয়া যাইবে কিন্তু মহাত্মা রামমোহনের গুণ-জ্যোতিঃ আর কোন কালে নির্ব্বাপিত হইবার নয়।

রামমোহন রায়ের উপর ইংরাজদিগের কিরূপভাব তাহা মান্যবরা মিস্ কার্পেণ্টার কৃত "Last days in England of

Raja Ram Mohun Roy,, নামক পুস্তকে বিশেষ লিখিত আছে। এস্থলেও কতকগুলি লোকের বিষয় লিখিত হইল। ভারতের নাম শুনিলে যাহার শরীরস্থ প্রতি লোমকূপ হইতে প্রজ্জ্বলিত অগ্নিশিখা বাহির হইত, সেই মেকলে পর্য্যন্ত রামমোহনের সহিত আলাপ করিবার জন্য লোলুপ হইয়াছিলেন। তদীয় কনিষ্ঠ পুত্র রমাপ্রসাদ রায় মহাশয় তাঁহার পরিবারস্থ বালকদিগের ডভ্‌ডেন কলেজে শিক্ষা বিষয়ে তাঁহার পিতৃবন্ধু প্রসিদ্ধ ডাক্তার ডফের পরামর্শ চান। ডাক্তার ডফ এ বিষয়ে তাঁহাকে যে এক পত্র লিখেন তাহার এক স্থানে লিখিত ছিল যে "আপনার মহামান্য পিতার মহৎ নাম আমার অন্তঃকরণে চিরকালের মত খোদিত রহিয়াছে।" সভ্যতার আকরভূমি ইউরোপ ও আমেরিকাখণ্ডে এখনও এই মহাত্মার পবিত্র নাম সকলের অন্তঃকরণে সমভাবে দেদীপ্যমান রহিয়াছে। কয়েক বৎসর গত হইল, রামমোহনের জনৈক বংশীয় ব্রিস্‌টলের মিউজিয়মে উপস্থিত হন। তাঁহার সহিত তাঁহার পরম বন্ধু অধুনাতন প্রসিদ্ধ জেকবহোলিওকও ঐ স্থানে গমন করেন। এখানে রাজার একটি সুন্দর চিত্র আছে। তাঁহাদিগের ঐ স্থানে উপস্থিতির অল্পক্ষণ পরেই মিউজিয়মের অধ্যক্ষ তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হন। তিনিও হোলিওকের এক জন বন্ধু। হোলিওক রামমোহনের বংশীয়ের পরিচয় দিবার জন্য তাঁহাকে বলেন—"দেখিতেছেন ইনি কে?" তৎপরে তাঁহার পরিচয় দেওয়া হইল। তখন অধ্যক্ষ পরমাহ্লাদ সহকারে তাঁহার সহিত করমর্দ্দন করিয়া বলিলেন যে, "রাজার চিত্র এখানে আছে বলিয়া আমরা আপনাদিগকে অহঙ্কৃত মনে করি।" অনন্তর সেখান হইতে

তাঁহারা ষ্টেপ্‌লটন গ্রোভ দেখিতে যান; সেখানে মেজর বিক্‌নেল নামক এক ব্যক্তি * তাঁহাদিগকে বলেন—সেই অসাধারণ রাজার চিত্র কি স্ত্রী কি পুরুষ সকলেরই অন্তঃকরণে এখনও সমভাবে অঙ্কিত রহিয়াছে, উহা আর কোন কালে বিলুপ্ত হইবার নয়।" রামমোহন রায়ের বিশ্বাস ছিল যে, আমরা সকলেই এক অমৃতময়-পুরুষের সন্তান। † তিনি কি ভারত, কি ইংলণ্ড, কি স্কটলণ্ড সকল দেশকেই সমচক্ষে দেখিতেন। ভারতবর্ষের বিষয় যেমন তিনি পার্লামেণ্টে উত্থাপিত করেন, সেইরূপ আয়র্লণ্ডের পক্ষেও ক্রটী করেন নাই। বলা বাহুল্য যে এই সকল অসামান্য গুণে অদ্যাপিও তিনি স্বদেশ বিদেশ পূজ্য হইয়া রহিয়াছেন।

রামমোহন যে অসামান্য গুণে আপন পদমর্য্যাদা রক্ষা করিতে জানিতেন অধুনাতন অতি অল্প-সংখ্যক লোককে সেই প্রণালী অবলম্বন করিতে দেখা যায়। তিনি পদমর্য্যাদা বৃদ্ধিলালসায় কখন কাহারও দ্বারস্থ হন নাই অথচ তাঁহার নাম শুনিলে বিদেশীয়গণ পর্য্যন্ত অশ্রুমোচন না করিয়া থাকিতে পারেন না। তাঁহার কার্য্যের মধ্যে এরূপ সুশৃঙ্খলতা ছিল যে একদা সুসভ্য ইংরাজগণকেও তৎপ্রতি সতৃষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে হইয়াছিল। তাঁহার আশা ছিল ভারতের ভবিষ্যদ্বংশ তাঁহার মনোরথ পূর্ণ করিবে, কিন্তু দুঃখের বিষয় এখন সকলেতেই তদ্বিপরীত ভাব লক্ষিত হইতেছে। এখন ভারত

---

* সুপ্রসিদ্ধ পারস্য কবি হাফেজের কবিতাগুলি ইনিই ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ করেন।

† The Fatherhood of God and the Brotherhood of Man.

এমনি বিচিত্র ভাব ধারণ করিয়াছেন যে প্রকৃত লোকের সংখ্যা অঙ্গুলি মাত্রে গণনা করা যায় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। দুঃখের বিষয় উৎসাহ অভাবে ক্রমে ঐ অল্প সংখ্যারও লোপ হইবার উপক্রম হইয়া উঠিয়াছে। বিধাতা তাঁহাদিগকে যাঁহাদের করনাস্ত করিয়াছেন তাঁহাদের যদি এ সম্প্রদায়ের উপর কণামাত্র কৃপাদৃষ্টি থাকিত, যদি তাঁহারা প্রকৃত উৎসাহ পাইতেন তাহা হইলে জন-সাধারণেরও প্রকৃত শিক্ষা লাভ হইত এবং ঐ সকল লোককেও অন্নাভাবে অকালে কালগ্রাসে নিপতিত হইতে হইত না।

পরিণামদর্শী রামমোহন দেশের ভবিষ্যৎ অবস্থা এক প্রকার জানিতে পারিয়াছিলেন। একারণ তিনি নানা উপায় অবলম্বন করেন। হিন্দু কলেজ স্থাপিত হইলে পর তিনি স্বদেশের শিক্ষা বিষয়ে নিশ্চিন্ত হন নাই। তিনি অন্যের উপর কোন বিষয় নির্ভর করিয়া সুস্থ থাকিবার লোক ছিলেন না। একারণ আপন ব্যয়ে একটি বিদ্যালয় সংস্থাপন করেন। এদেশীয় বালকবৃন্দকে যথার্থ নীতি শিক্ষা দেওয়াই উক্ত বিদ্যালয় স্থাপনের প্রধান উদ্দেশ্য। দুঃখের বিষয় সেটী অনেক দিন হইল জলবিম্বের ন্যায় জলেই মিশিয়া গিয়াছে। স্ত্রীজাতির প্রতি তাঁহার অসামান্য শ্রদ্ধা ছিল। তাঁহার পুত্রবধূ কি বাটীর অপর কেহ তাঁহাকে প্রণাম করিলে তিনি প্রতিনমস্কার করিতেন। তিব্বত বাস কালীন তদ্দেশীয় মহিলা কুলের ব্যবহারে তিনি পরম পরিতোষ লাভ করেন এবং এই সময় হইতেই স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে সবিশেষ মনোযোগী হন। এদেশীয় স্ত্রীজাতির মানসিক শক্তি সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছিলেন—যেখানে মৃত্যুর নাম

শুনিলে পুরুষেয়া ভয়ে কম্পান্বিত হইয়া পড়ে সেখানে স্ত্রী-লোকেরা মৃতপতির চিতারোহণে অম্লান বদনে দেহ পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। এমন স্থলে এদেশীয় স্ত্রীলোকদিগকে মানসিক শক্তি হীন বলা নিতান্ত আশ্চর্য্যের বিষয় সন্দেহ নাই।

অনেকেরই বিশ্বাস রামমোহন রায় স্ত্রীশিক্ষার বিরোধী ছিলেন কিন্তু যাঁহারা গোগারলী নামা জনৈক খৃষ্টীয় মহিলার নাম শুনিয়াছেন তাঁহারা কখনই একথা বলিবেন না। অন্তঃপুর-শিক্ষাসম্বন্ধে গোগারলী রামমোহন কর্ত্তৃক বিশেষ সাহায্য প্রাপ্ত হন। রামমোহন বলিতেন "সমাজের উৎকর্ষ সাধন পক্ষে স্ত্রী-শিক্ষার বিশেষ আবশ্যক। শিক্ষাভাবেই এ দেশীয় স্ত্রীজাতির এতাধিক শোচনীয় অবস্থা দাঁড়াইয়াছে। প্রকৃত শিক্ষা পাইলে যে তাঁহাদের বর্ত্তমান অবস্থার বিশিষ্টরূপ পরিবর্ত্তন হইবে তাহার আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু তাই বলিয়া যে অধুনাতন অপরিণামদর্শী কতকগুলি লোকের ন্যায়, কুলকামিনীদিগকে লইয়া, যেখানে সেখানে গমনাগমন করিতে হইবে তাহা তাঁহার মতে কদাচ ন্যায়সঙ্গত বলিয়া উক্ত হয় নাই। যে দেশ পরা-ধীন সে দেশের মহিলাগণকে স্বাধীন করিতে যাওয়া, কোন্ সহৃ-দয় সমাজহিতৈষী না গর্হিত কার্য্য বলিয়া স্বীকার করিবেন? যদি ভারতের প্রধান সমাজ-সংস্কারকের এবিষয়ে কিছুমাত্র মত থাকিত তবে অবাধে তিনি আপন পরিবার মধ্যে এই অপূর্ব্ব প্রথার প্রচলন করিতে পারিতেন। স্ত্রীস্বাধীনতার পক্ষসমর্থন-কারী অনেকে বলিয়া থাকেন যে এদেশীয়দিগের ইংরাজদলের সহিত বন্ধুভাবে মিলিত হইবার ইহাই প্রকৃষ্ট উপায়। কিন্তু এটী যে তাঁহাদের মহদ্ভ্রম তাহা সহজেই প্রতিপন্ন হইতেছে। স্ত্রীস্বাধী-

নতা সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ গিবন কি বলেন তাহা স্মরণ আবশ্যক। ইংরাজদিগের রীতিনীতি বিশেষ না জানিয়া, তাহাদের ন্যায় স্বদেশ-গৌরব রক্ষায় যত্নশীলতা প্রভৃতি উৎকৃষ্ট গুণ শিক্ষা না করিয়া—ফল কথা সর্ব্বতোভাবে তাহাদের ন্যায় শিক্ষিত না হইয়া এসকল বিষয়ে হস্ত নিক্ষেপ করিতে যাওয়া আর বৃক্ষশাখায় উপবেশনপূর্ব্বক সেই ভাগ কর্ত্তন করা উভয়ই সমান।

রামমোহন উপবীতধারী ছিলেন বলিয়া অনেক উন্নতিশীল ব্যক্তি অনেক কথা বলিয়া থাকেন। তাঁহাদেব ধ্রুব বিশ্বাস যে, উপবীত ত্যাগ না করিলে ঈশ্বরের পবিত্র রাজ্যে প্রবেশাধিকার থাকে না। একারণ তাঁহারা উপবীত ভস্ম করিয়া, কেহ কেহ বা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া সকল জঞ্জাল একেবারেই মিটাইয়া দেন। উপবীত রাখা যে এত দূর গর্হিত কার্য্য তাহা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধির অগম্য।

আজকালকার কথা স্বতন্ত্র; কিন্তু উপবীত যে উৎকৃষ্ট শিক্ষাদায়ক তাহার আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। উপবীত ধারণ করিয়া দেহ সংস্কৃত হইলে পাপপথে ঘৃণা উৎপাদন হইবে—লোকের মন দৃঢ়রূপে ধর্ম্মের পবিত্র সূত্রে আবদ্ধ হইবে, উপবীতের ইহাই মুখ্য উদ্দেশ্য। অনেকে আপন আবাস গৃহমধ্যে পবিত্র প্রতিমূর্ত্তি সকল রাখিয়া থাকেন; খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীদিগের মধ্যে দেখা যায় অনেকেই খৃষ্টের "ক্রশ" অঙ্গের কোন না কোন স্থানে আবদ্ধ করিয়া রাখেন। এই সকলের প্রকৃত উদ্দেশ্য এই যে সংসারের নানা রূপ প্রলোভন মধ্যে থাকিয়াও পবিত্র ভাব অনুক্ষণ হৃদয়ে জাগরূক থাকিবে। আমাদের সামান্য উপবীতেরও তাহাই উদ্দেশ্য। যজ্ঞোপবীত ধারণ করিবার কালে যে সকল

উপদেশ দেওয়া হয়, উপবীত তাহার চিহ্ন স্বরূপ থাকিয়া সেই সকল পবিত্র উপদেশ স্মরণ করিয়া দিবে এই কারণেই আর্য্য ঋষিগণ উপবীত ধারণের বিধি প্রচলিত করিয়া গিয়াছেন। ইহার আর কোন গূঢ় উদ্দেশ্য নাই। উপবীত ত্যাগ করিয়া ধর্ম্ম লইয়া মহা আড়ম্বর করা ও ইচ্ছাপূর্ব্বক সমাজ লইয়া একটা গোলযোগ করার আবশ্যক? ঈশ্বর অমৃতময়—যেরূপ ভাবে থাকিয়াই কেন তাঁহার মহিমা কীর্ত্তন করা যায় তাহাতেই হৃদয় পরিতৃপ্ত ও স্বর্গীয় ভাবে পূর্ণ হইয়া থাকে।

মহাত্মা রামমোহন যখন এই পবিত্র পথের পথিক হন তখন তাঁহার ধর্ম্মাড়ম্বর প্রভৃতি কিছু মাত্র থাকে নাই। নূতন কোনরূপ দেখিলে সাধারণ লোকে প্রায়ই ভীত হইয়া থাকে। রামমোহনের সময়েও তাহাই ঘটিয়া ছিল। তাহারা তাঁহার পবিত্র পথে অনেক বিঘ্ন দেয়। এমন কি তাঁহার জীবন নাশের জন্যও অনেক দুরাত্মা বদ্ধপরিকর হইয়াছিল। একারণ সময়ে সময়ে তাঁহাকে রক্ষক সঙ্গে লইয়া বাহির হইতে হইত। একদা রামমোহন পথিমধ্যে একাকী ভ্রমণ করিতে ছিলেন এমন সময় তদানীন্তন ধর্ম্মসভার কতকগুলি চূড়ামণি মহোদয়গণ সময় বুঝিয়া তৎপল্লীস্থ জন কয়েক বালককে তাঁহার গাত্রে ধূলি দিয়া কটূক্তি করিতে শিখাইয়া দেয়, বালকেরা মহামহোপাধ্যায় মণ্ডলীর শিক্ষানুযায়ী কার্য্য সমাধা করিলে পর সুধীর রামমোহন তাহাদিগকে আদর আস্থা প্রদর্শন পূর্ব্বক স্বীয় উদ্যানভবনে লইয়া গিয়া খেলানা, মিষ্টান্ন প্রভৃতি দিয়া বিদায় করিয়া দিতেন। আশ্চর্য্যের বিষয় কিছু দিন পরে সকলই আবার স্থির ভাব ধারণ করিয়া ছিল। তাঁহার শত্রু তাঁহার মিত্র হইল। এমন

কি তাঁহার জননী পর্য্যন্ত তাঁহার সহিত পুনর্ম্মিলিত হন। ইহার প্রকৃত কারণ এই যে রামমোহনের কোনরূপ অন্যায় ব্যবহার ছিল না। সমাজ কিছু দিনের জন্য তাঁহাকে পরিত্যাগ করে কিন্তু স্বেচ্ছাচার ভাব ধারণ করিয়া তিনি কখনই সমাজ পরিত্যাগ করেন নাই। মহাত্মা স্পষ্টই বলিয়া গিয়াছেন যে তিনি কখনই হিন্দুধর্ম্মকে আক্রমণ করেন নাই, পৌত্তলিকতা যে আর্য্যদিগের শাস্ত্রবিরুদ্ধ তাহাই কেবল তিনি প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। * কেবল মাত্র সত্যের উপর নির্ভর করিয়া রামমোহন পবিত্র পথ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার নাম করিলে এখন একজন মহাপৌত্তলিকও বলিবেন যে তিনিই যথার্থ পবিত্র ছিলেন। আজকাল সকলই বিপরীত। এক্ষণে সমাজ ত্যাগ করাই অনেকে বীরত্বের কার্য্য বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। ইতিপূর্ব্বে তাঁহার সম্বন্ধে যথাস্থলে আমরা একটি বিষয় উল্লেখ করিতে বিস্মৃত হইয়াছি, এ স্থলে তাহা প্রকাশ করা গেল। রামমোহন বাল্যকালে গলদেশে একটি শালগ্রাম বাঁধিয়া যেখানে সেখানে গমনাগমন করিতেন। ধর্ম্মানুসন্ধিৎসু রামমোহন একদা বর্দ্ধমানে কোন পরমহংসের নিকটে গমন করেন। স্বামীজি প্রথম দৃষ্টেই তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন

* The ground which I took in all my controversies was, not that of opposition to Brahminigm, but to a perversion of it; and I endeavoured to show that the idolatry of the Brahmins was contrary to the practice of their ancestor's, and the principles of the ancient books and authorities which they profess to revere and obey. তদীয় বন্ধু মিষ্টার গর্ডনকে যে তিনি পত্র লিখেন উপরিস্থ কয়েক পংক্তি তাহার একস্থল হইতে উদ্ধৃত হইল।

যে "যে ব্যক্তি পাথর গলায় বাঁধিয়া ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিয়া বেড়ায় তাহার সহিত আবার ধর্ম্ম সম্বন্ধে কি কথা কহিব ?"

'পাথর পূজে হর মিলে ত মঁই পূজে পাহাড় ।'

কথিত আছে এই সময় হইতেই মহাত্মার পবিত্র আর্য্যধর্ম্ম প্রতি দৃষ্টি পতিত হয় ।

খাদ্য সম্বন্ধেও রামমোহনকে অনেকেই অনেক কথা বলিয়া থাকেন কিন্তু তিনি কোনরূপ অন্যায় প্রকৃতির লোক ছিলেন না। তদীয় ইংলণ্ড বাসিনী বন্ধু মিস্ হেয়ার রামমোহনের জনৈক বংশীয়কে কথায় কথায় বলিয়াছিলেন যে "গো মাংস বলিলে অন্য কথা দূরে থাকুক রাজা উহা স্পর্শও করিতেন না। "স্বেচ্ছাচার ও আত্মশ্লাঘা তিনি হৃদয়ের সহিত দ্বেষ করিতেন। রামমোহন অদ্যাপি জীবিত থাকিলে ভারতের ভাব যে কিরূপ দাঁড়াইত তাহা কল্পনানেত্রে বারেক দর্শন করিয়াও হৃদয় অনুপম আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া থাকে।

রামমোহনের রংপুরের দেওয়ানী পদ লইয়া অনেকে অনেক কথা বলিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের সংস্কার যে তিনি উৎকোচ গ্রহণ করিতেন। যে রামমোহন পিতৃধনের সমস্ত অধিকারী হইয়াও তাহা হইতে দূরে থাকিতে কুণ্ঠিত হন নাই, ধর্ম্মের জন্য সমস্ত পরিত্যাগ পূর্ব্বক যিনি ষোড়শ বৎসর বয়ঃক্রম কালে সন্ন্যাসীর ন্যায় দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়াছিলেন, হৃদয়সর্ব্বস্ব ধর্ম্মের জন্য যিনি আত্মত্যাগ করিতেও অপ্রস্তুত ছিলেন না সেই রামমোহনের নামে এরূপ কলঙ্কার্পণ কতদূর ন্যায়সঙ্গত তাহা সহৃদয়গণেরই বিবেচনার স্থল ; এ বিষয়ে আমাদের অধিক বলা বাহুল্য মাত্র। তৎকালে কলেক্‌টরগণের দেওয়ানদের জন্য বেতন ব্যতীত গভর্ণমেণ্ট

হইতে যে নিয়মে নজর গ্রহণের ধার্য্য থাকে, তিনি তাহাই মাত্র গ্রহণ করিতেন এবং ইহাতেই বাৎসরিক দশহাজার টাকা আয়ের সম্পত্তি করিতে সমর্থ হন। অন্যান্য দেওয়ানগণ যেরূপ উপার্জ্জন করিয়া গিয়াছেন রামমোহন তাহার দশ অংশের এক অংশও করিতে পারেন নাই। অর্থ বিষয়ে তিনি যেরূপ নিস্পৃহ ছিলেন তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, এক্ষণে এ বিষয়ের একটী সুন্দর গল্প এ স্থলে বিবৃত হইতেছে;—বর্দ্ধমানের রাজা তেজচাঁদের পুত্র প্রতাপ চাঁদের মৃত্যু হইলে পর তিনি পুত্রশোকে একান্ত কাতর হইয়া পড়েন। এই সময় রাধাপ্রসাদ রায় মহাশয় কার্য্যোপলক্ষে বর্দ্ধমানে থাকিতেন। তাঁহার অঙ্গসৌষ্ঠব অনেকটা প্রতাপ চাঁদের ন্যায় ছিল। রাজা তেজচাঁদ কোন সুযোগে তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া পুত্রশোকে একেবারে অধীর হইয়া উঠেন এবং রাধাপ্রসাদ রায় মহাশয়ের নিকট আপন অমাত্য ও পারিষদবর্গকে এই বলিয়া পাঠাইয়া দেন যে যদি তিনি রাজা তেজচাঁদের নিকট অবস্থান করেন তবে রাজা তেজচাঁদ তাঁহাকে আপন অর্দ্ধেক সম্পত্তির এখনিই দান পত্র লিখিয়া দিতে প্রস্তুত আছেন এবং অপরার্দ্ধও তাঁহার কর্ত্তৃত্বাধীনে থাকিবে। মহামনা রাধাপ্রসাদ প্রত্যুত্তরে বলিয়া পাঠান যে পিতার আজ্ঞা ব্যতীত তিনি এ বিষয়ের বিশেষ কোন উত্তর দিতে পারেন না। তাঁহার এরূপ বলিবার কারণ এই যে বর্দ্ধমানাধিপের সহিত রায় বংশের বহুদিন হইতে ঘোর বিবাদ—বর্দ্ধমানাধিপ রামকান্তকে নানারূপ বিপদ্‌গ্রস্ত করিয়াছিলেন; এ কারণ রামমোহন বর্দ্ধমানের রাজার নাম পর্য্যন্ত করিতেন না। রাধাপ্রসাদ তাহা বিশেষ জানিতেন। যাহা হউক তিনি রাজা তেজচাঁদের বিশেষ অনুরোধে লিপিসংযোগে

রাজা রামমোহনের এ বিষয়ে মতামত জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠান। পুত্রের পত্র পাইয়া রামমোহনের স্বাভাবিক প্রশান্তমূর্ত্তি বিপরীত ভাব ধারণ করিল; তিনি রাধাপ্রসাদকে তৎক্ষণাৎ এই বলিয়া পাঠাইলেন যে যদি তিনি বর্দ্ধমানের রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া থাকেন তবে সেই দিবস হইতে তাঁহার ত্যজ্য পুত্র হইয়াছেন। পিতৃবৎসল রাধাপ্রসাদ পিতার অভিমত কার্য্যই করিয়াছিলেন। কথিত আছে এই ঘটনায় রামমোহন পরমাহ্লাদিত হইয়া রাধাপ্রসাদকে সস্নেহালিঙ্গন দিয়াছিলেন।*

অনেকানেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের প্রবল অর্থলিপ্সা দেখিয়া রামমোহন বড়ই চিন্তিত হইতেন। এই দলের মধ্যে যাঁহার সহিত তাঁহার পরিচয় হইত, তিনি সদুপদেশ দিয়া তাঁহাকেই পবিত্র পথে আনয়নের চেষ্টা করিতেন। প্রসিদ্ধ ভরতচন্দ্র শিরোমণি মহাশয়কে† তিনি অতিশয় স্নেহ করিতেন। তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইলে তিনি (রামমোহন) তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে বলিতেন—"দেবতা, "ধূর্ত্তৈর্জ্জগৎ বঞ্চিতং।" ‡

কার্য্যোপলক্ষে বর্দ্ধমানে অবস্থান কালীন কোন উচ্চপদস্থ ইংরাজের সহিত রাধাপ্রসাদের কোন কারণে ঘোর বিবাদ উপস্থিত হয়। একে বাঙ্গালীর সহিত ইংরাজের বিবাদ, তাহাতে আবার সেই ভয়ানক সময়—"মণিকাঞ্চন যোগ!" রাধাপ্রসাদ ভয়ানক

* রাজা রামমোহন রায়ের সহিত বর্দ্ধমানের রাজার বিবাদ পরে শেষ হইয়াছিল। রাজা তেজচাঁদ স্বয়ং তাঁহার নিকট আসিয়া এ বিবাদ ঘুচাইয়া যান।

† প্রায় ১০।১১ বৎসর হইল ইনি পরলোক গত হইয়াছেন।

‡ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগকে তিনি "দেবতা" বলিয়া সম্বোধন করিতেন।

বিপদে পতিত হইয়া পিতাকে কোন উপায় করিতে লিখেন, আর তিনি যে বাস্তবিক নির্দ্দোষী তাহাও তাঁহাকে জানান। রামমোহন সমস্ত অবগত হইয়া পুত্রকে প্রত্যুত্তরে এই বলিয়া পাঠান যে, "যদি তুমি বাস্তবিক নির্দ্দোষী হও, তবে আর আমার অন্য কোন উপায় করিবার আবশ্যক কি? বিচারে তোমার নির্দ্দোষিতা প্রমাণ আবশ্যক। আর যদি তুমি যথার্থ দোষী হও, তবে তাহার অবশ্য ফল ভোগ করিতে হইবে। আমি, আমার ক্ষমতা সত্ত্বেও অন্য কোন উপায় কদাচ করিব না।" অতঃপর বিচারে রাধাপ্রসাদের নির্দ্দোষিতা প্রমাণ হয়। তিনি জয়ী হইয়া পিতৃসন্নিধানে আগমন করিলে পর, রামমোহন তাঁহাকে সস্নেহালিঙ্গন দিয়াছিলেন।

বিধবা-বিবাহের প্রস্তাব সর্ব্বপ্রথম তিনিই উত্থাপন করেন; কিন্তু উহা কার্য্যে পরিণত করিবার সময় পান নাই। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে আদি ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপিত হয়* এবং তৎপর বৎসর তিনি দিল্লীশ্বর কর্তৃক মহামান্য সহকারে "রাজা" উপাধি প্রাপ্ত হইয়া ইংলণ্ড গমন জন্য তাঁহার দৌত্যপদে নিযুক্ত হন। স্নেহাস্পদ পালক পুত্র রাজারাম রায় রামরতন মুখোপাধ্যায়, রামহরি দাস ও জনৈক রজক সমভিব্যাহারে লিভারপুলগামী অলবিয়ন নামক অর্ণবপোতারোহণে ইয়োরোপ যাত্রা করেন। † তথায়

* ব্রাহ্মসমাজে গীতবাদ্য সর্ব্বপ্রথম, তিনিই প্রচলিত করেন। আদি ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপিত হইলে পর গোবিন্দ মালা নামক জনৈক গায়ক তথায় নিযুক্ত হন। কথিত আছে এই ব্যক্তি অতি সুন্দর সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন।

† রাজা রামমোহনের সহিত যাঁহারা ইংলণ্ড গমন করেন তাঁহাদের প্রকৃত নাম পরিবর্ত্তন করিয়া তিনি আপন নামের যোগে নাম রাখেন। রামরতনের পূর্ব্বনাম—শম্ভু এবং রামহরি দাসের পূর্ব্বনাম—হরিদাস।

উপনীত হইয়া তিনি যে সকল কার্য্য সম্পাদন করেন তাহা আর বিজ্ঞ সমাজের অবিদিত নাই। সুতরাং ঐ সকলের পুনরুল্লেখে নিরস্ত হওয়া গেল। তাঁহার জনৈক সহযাত্রী তাঁহার সম্বন্ধে যেরূপ লিখিয়াছিলেন তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দেওয়া গেল।

"জাহাজে প্রথমতঃ তাঁহার পৃথক রসুইশালা না থাকায় বিশেষ কষ্ট হয়। কেবল একটি মাত্র মাটির উনুন ছিল। তিনি ক্যাবিনেই আহার করিতেন। তাঁহার ভৃত্যদের সামুদ্রিক পীড়া হইয়াছিল কিন্তু তিনি এক দিনের জন্যও ওরূপ যন্ত্রণাদায়ক পীড়ায় পীড়িত হন নাই। কখন তাঁহাকে স্ফূর্ত্তি-হীন দেখা যায় নাই। দিবসের প্রায় অধিকাংশ ভাগ সংস্কৃত ও হিব্রু পাঠে অতিবাহিত করিতেন। সকাল, সন্ধ্যা ডেকের উপর উঠিয়া বায়ু সেবন করিতেন। বৈকালে আহারের পর যখন টেবিল হইতে চাদর উঠাইয়া ফল ইত্যাদি আনা হইত তখন তিনি ক্যাবিন হইতে বাহির হইয়া সহযাত্রীদিগের সহিত কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইতেন এবং এক আধ গেলাস সুরা পান করিতেন। এইরূপে তিনি সকলেরই নিকট মান্যের ও সম্ভ্রমের পাত্র হইয়া উঠেন। এমন কি জাহাজস্থ নাবিকেরাও তাঁহার সাহায্যার্থ সর্ব্বদাই প্রস্তুত হইয়া থাকিত। একটু জোর বাতাস বহিলে তিনি ডেকের উপর উঠিয়া প্রকৃতির সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া বিমোহিত হইতেন।"

ইংলণ্ড গমন কালীন একদা ভারত সাগরে তাঁহাদের জলযান ঘোর ঝড়ে মহা ভয়ানক অবস্থায় পতিত হয়। এসময়ে সকল-কেই জীবনাশায় এক প্রকার জলাঞ্জলি দিতে হইয়াছিল। রাম-

মোহন তখন সহচরবর্গকে লইয়া ঈশ্বরের উপাসনায় নিযুক্ত ছিলেন। এই সময়ে রামরতন যে একটি গীত রচনা করেন তাহা নিম্নে প্রকাশিত হইল ;--

ওহে কোথায় আনিলে,—
আনিয়ে জলধি মাঝে তরঙ্গে তরী ডুবালে।
কোথা রইলে মাতা পিতা, কে করে স্নেহ মমতা,
প্রাণ প্রিয়ে রইলে কোথা বন্ধু সকলে ॥
চতুর্দ্দিক নীরাকার, নাহি দেখি পারাপার,
প্রাণ বুঝি যায় এবার ঘূর্ণিত জলে ॥

এই অসাধারণ ব্যক্তি ভারতকে শোকসাগরে ডুবাইয়া ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে ২৭ শে সেপ্টেম্বর ইংলণ্ড নগরীর অন্তঃপাতী ব্রিষ্টল নগরে মানবলীলা সম্বরণ করেন।

সম্পূর্ণ।

ভ্রমসংশোধন।

ইতিপূর্ব্বে এই পুস্তকের কোন স্থলে "মেস্‌নাভি কোন পারস্য কবি বিরচিত ধর্ম্মনীতি ও রাজনীতি সম্বন্ধীয় গ্রন্থ" এইরূপ লিখিত আছে। তৎস্থলে "মস্‌নাভি কবি জলালদ্দিন রুমি রচিত এইরূপ হইবে।